

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালী

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালী

[পঞ্চম [illegible] শ্রেণীর পাঠ্য]

সংশোধিত সংস্করণ

৭৬

শ্রীঅমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম. এ., বি. টি.
প্রধান শিক্ষক, উত্তর দমদম বিদ্যাপীঠ (বালক),
বিরাটী, কলিকাতা ৫১

প্রাপ্তিস্থান
ইণ্ডিয়ান পাবলিশার্স
৪, নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা-৯

সূচিপত্র

প্রকাশক : শ্রীতপনেশ্বর মুখার্জি, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ৩৪সি, ঈশ্বর গুপ্ত রোড, কলিকাতা-২৮।

মুদ্রাকর : শ্রীগণেশ কুমার ভাণ্ডারী, লক্ষ্মী প্রিন্টার্স, ২১/১বি পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯।

মূল্য : ৮.৮০

স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা



শহীদ মঙ্গল পাণ্ডে

ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য ডুবে গিয়েছিল সেদিন, যেদিন ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন তারিখে, পলাশীর যুদ্ধে, অর্থাৎ নবাব সিরাউজদ্দৌলার পতনে! এই সময়ে ইংরেজ ভারতীয় সমাজকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল। তারা ভারতের তাত ভেঙে ফেলেছে, এমন কি সুতো কাটবার চরকাটা পর্যন্ত ধ্বংস করেছে। তারা ভারতের কৃষি ও শিল্প নষ্ট করেছে।

এই অবস্থার একশো বছর পরে ভারতের মানুষ স্বদেশের স্বাধীনতার কথা ভাবতে শুরু করলেন। ভারতীয় সৈন্যদলেও দেখা দিল অস্থিরতা। তাঁরা তখন মাইনে পেতেন সাত টাকা। তা থেকে দু'টাকা সামরিক বিভাগের জন্য কেটে নেওয়া হত। ইংরেজ সৈন্যের দক্ষতা কম থেকেও তারা মাইনে পেত ভারতীয় সৈন্যের চেয়ে তিন গুণ।

ভারতীয় সিপাহীরা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখলেন। সারা ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল। বাঙলাও পিছিয়ে থাকল না।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ বিকেলের পড়ন্ত বেলায় ব্যারাকপুর সৈনিক ছাউনিতে তীব্র রণরোষে মহাবিদ্রোহের প্রথম অগ্নিময় গুলিটি ইংরেজ অফিসারের বুক লক্ষ্য করে ছুটে এলো ৩৪ নম্বর রেজিমেণ্টের ১৪৪৬ নম্বর সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডের মাস্কেট বন্দুকের নল থেকে।

যুদ্ধের পর ধরা পড়লেন মঙ্গল পাণ্ডে। ৬ই এপ্রিল সামরিক বিভাগ তাঁর ফাঁসির হুকুম দিল। মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর হলো ৮ই এপ্রিল, ভোর ৫ টায়। শহীদ হলেন মহাবিপ্লবী মঙ্গলপাণ্ডে। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৬।

মহাবিদ্রোহের প্রথম শহীদ মঙ্গল পাণ্ডে—স্বাধীনতায় পথপ্রদর্শক। তাঁর ঠিকানা—নাম-মঙ্গল পাণ্ডে, গ্রাম—নগবা, জেলা—বালিয়া। তৎকালীন গাজীপুর। জন্মবর্ষ ১৮৩১।

বালিয়াচকে নির্মিত শহীদ স্মারক দ্বারে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা আছে—

"১৮৫৭—শহীদ মঙ্গল পাণ্ডে-দ্বার।'

তাঁর বংশধরগণ পরবর্তী কালে মীরাট শহরে বসবাস শুরু করেন। এই স্থানকে বলা হয়—'পাণ্ডো কা চৌক।'

অনুশীলনী

১। সিপাহী বিদ্রোহ কি?
২। সিপাহীরা কাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন?
৩। মঙ্গল পাণ্ডে শহীদ হলেন কোথায়?

মঙ্গল পাণ্ডে বাঙালী না হলেও বাংলায় স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে তাঁর পরিচয় দেওয়া হল।



ফাঁসির মঞ্চে প্রথম শহীদ ক্ষুদিরাম

"একবার বিদায় দে মা
ঘুরে আসি,
হাসি হাসি পরব ফাঁসি
দেখবে ভারতবাসী।"

যাঁকে ঘিরে এই গানখানা আমাদের প্রাণে ঝংকার তোলে, যাঁকে উপলক্ষ্য করে এই গান, তিনিই অগ্নিযুগের অগ্নিশিশু ক্ষুদিরাম বসু।

ক্ষুদিরামের ছেলেবেলাতেই তাঁর মা-বাবা মারা যান। তাই তিনি বড়দিদি অপরূপা দেবীর কাছেই মানুষ হন। ক্ষুদিরামের আগে আরো দুই ভাই শিশুকালেই মারা যান। তাই ভাইয়ের অকালমৃত্যুর আশঙ্কায় অপরূপা দেবী তাঁর

মায়ের কাছ থেকে তিন মুঠো ক্ষুদ দিয়ে ছোট ভাইটিকে কিনে নেন। আর তাঁর নাম রাখা হল 'ক্ষুদিরাম'।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর ক্ষুদিরামের জন্ম হয় মেদিনীপুর জেলার হাবিবপুরে। তিনি বড় হয়ে লেখাপড়া করেন তমলুকের হ্যামিল্টন স্কুলে এবং পরে মেদিনীপুরের কলেজিয়েট স্কুলে। এই সময় ঐ স্কুলের শিক্ষক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সাথে তাঁর পরিচয় হয়। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন বিপ্লবী। ক্ষুদিরামকেও তিনি দীক্ষা দিলেন বিপ্লবী-মন্ত্রে। তাই ছেলেবেলা থেকেই তিনি দুঃসাহসী, বেপরোয়া।

লেখাপড়ায় তেমন মন থাকল না ক্ষুদিরামের। তিনি শুরু করলেন স্বদেশ-সেবা। আর্তের সেবায় ছুটে যেতেন তিনি। আবার গুপ্ত সমিতির নির্দেশমত কাজ করতেন তিনি।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরে এক শিল্প-প্রদর্শনী হয়। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নির্দেশে সেই প্রদর্শনীর গেটের কাছে



ক্ষুদিরাম মেলায় বই বিলি করছেন

ক্ষুদিরাম 'সোনার বাংলা' নামে একটা নিষিদ্ধ বই জনসাধারণের কাছে বিলি করতে থাকেন। হঠাৎ পুলিশ এসে তাঁকে ধরতে গেলে পুলিশকে এক ঘুষি মেরে তিনি পালিয়ে

যান। অবশ্য পরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের দায়ে আদালতে মামলাও আনা হয়। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ না থাকায় মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। তিনি মুক্তি পান।

যখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তখন শুরু হয়েছিল বিলেতি কাপড় পোড়ানো, বিলেতি নুন বর্জন, বিলেতি জিনিস বর্জনের পালা। এসব কাজেও মেতে ওঠেন ক্ষুদিরাম।

এরপর শুরু হল বিপ্লবীদের জন্য ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহের কাজ। ১৯০৭ সালে কালীপূজোর সময় তিনি ডাকহরকরার মেলব্যাগ ছিনিয়ে নেন। এই সময় বিপ্লবীরা শপথ নিলেন, এদেশ থেকে ইংরেজকে চিরতরে তাড়িয়ে দিতে হবে।

এর পর এল ক্ষুদিরামের বড় কাজ। মেদিনীপুরের কুখ্যাত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে হবে। কিন্তু তিনি তখন বদলি হয়ে গেছেন মজঃফরপুরে।

তখন কিংসফোর্ডকে হত্যার ভার দেওয়া হল দু'জন তরুণ বিপ্লবীর ওপর। একজন হলেন মেদিনীপুরের ক্ষুদিরাম বসু, আর একজন রংপুরের প্রফুল্ল চাকী। যাবার আগে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হল বোমা আর পিস্তল। তাঁদের আদেশ দেওয়া হল—বোমা ব্যর্থ হলে পিস্তল ব্যবহার করতে হবে।

১৯০৮ সালের মার্চ মাস। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী কলকাতা থেকে যাত্রা করলেন মজঃফরপুরের দিকে। তখন তাদের ছদ্মনাম রাখা হল—ক্ষুদিরামের নাম হল হরেন সরকার (কারো কারো মতে দুর্গাপ্রসাদ সেন) আর প্রফুল্ল চাকীর নাম হল দীনেশ রায়।

মজঃফরপুরে পৌঁছে তাঁরা উঠলেন এক ধর্মশালায়।

তাঁরা লক্ষ্য করলেন কিংসফোর্ড সাহেব রোজই রাত আটটার সময় তার ফিটন গাড়িতে করে বাড়ি ফেরেন।

সেদিন ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল।

রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারে একটা গাছের আড়ালে তৈরী হয়ে ওত পেতে দাঁড়ালেন তাঁরা দুজনে। চোখে তাঁদের জ্বলন্ত হিংসা আর ক্রোধ। মনে তাঁদের অফুরন্ত বল।

হঠাৎ একখানা ফিটন গাড়ি যাচ্ছিল। তাঁরা ভাবলেন এটাই কিংফোর্ডের গাড়ি। গাড়ি এল কাছে—নাগালের মধ্যে।

দুম্ করে বোমা ছুড়লেন ওঁর গাড়ির ওপর। গাড়িটায় আগুন ধরে গেল। তাঁরা মহা খুশী।

কিন্তু না, ভুল হয়ে গেছে। গাড়িতে কিংসফোর্ড ছিলেন না, ছিলেন দু'জন ইংরেজ মহিলা। এ কথা জেনে ক্ষুদিরাম হলেন দুঃখিত।

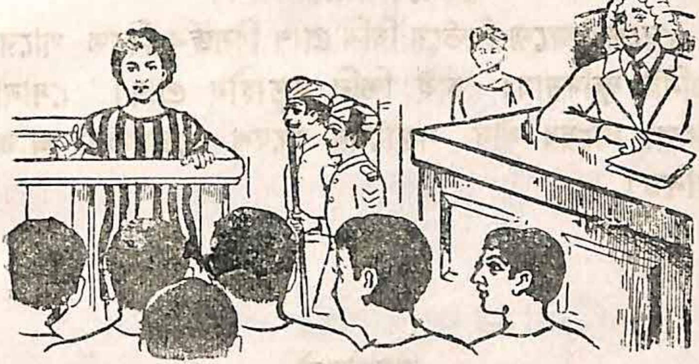
এদিকে বোমা ছোড়ার খবর পেয়ে পুলিশ চারদিকে ঘুরতে লাগল ক্ষুদিরামকে ধরবার জন্য। কিন্তু তিনি সারা রাত ধরে চব্বিশ মাইল পথ ছুটতে ছুটতে ভোরে উঠলেন ওয়াইনি রেলষ্টেশনের কাছে। ক্লান্তি, ক্ষুধা আর তৃষ্ণায় কাতর তিনি। দুর্ভাগ্য। পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন তিনি। তখনই পুলিশ সুপার এসে হাজির। তিনি বলে উঠলেন ঐটুকু ছেলে—ঐ মেরেছে বোমা! সেদিন ১৯০৮ সালের ১লা মে।

শুরু হল ক্ষুদিরামের বিচার। ক্ষুদিরামের পক্ষে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলেন মজঃফরপুরের উকিল কালিদাস বসু আর রংপুরের উকিল সতীশ চক্রবর্তী ও নৃপেন লাহিড়ী।

ক্ষুদিরামকে বিচারের সময় জিজ্ঞেস করা হলে বলেছিলেন "আমরা কিংসফোর্ডের খবর নিতাম। একদিন কাছারিতে

গিয়ে দেখলাম, তিনি বিচার করছেন। একবার মনে হল, তখনই বোমা ছুড়ে তাকে মেরে ফেলি। কিন্তু মনে হল অনেক নির্দোষের মৃত্যু হবে। তাই তখনই ক্ষান্ত হলাম।

কোর্টে উকিল যখন ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞেস করলেন—



ক্ষুদিরামের বিচার

—তুমি কাউকে দেখতে চাও কি ?

—হ্যাঁ, একবার মেদিনীপুর দেখতে চাই, আমার দিদি ও তাঁর ছেলে-মেয়েকে দেখতে চাই।

—তোমার মনে কোন দুঃখ আছে কি ?

—না, কিছু না।

আদালতের বিচারে হুকুম হল ক্ষুদিরামের ফাঁসি।

উকিল কালিদাস বসু আপীল করলেন হাই কোর্টে। কিন্তু সেই একই আদেশ– ক্ষুদিরামের ফাঁসি।

আবেদন করলেন বড়লাটের কাছে। কিন্তু সে আবেদনও অগ্রাহ্য হল।

১৯০৮ সালের ১১ই আগস্ট। ক্ষুদিরাম হাসিমুখে প্রথম শহীদ হলেন ফাঁসির মঞ্চে।

ক্ষুদিরাম নেই। কিন্তু তাঁর হাস্যোজ্জ্বল কচি মুখখানা সবার মাঝে অম্লান হয়ে আছে। মনে পড়ে সেই গান—

'দশ মাস দশদিন পরে,
ক্ষুদিরাম তোর আসবে ফিরে (মাগো)
(তখন) চিনতে যদি না পারো মা গো,
দেখবে গলায় ফাঁসি।'

দেশের জন্যে নির্ভয়ে যিনি প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারেন, তিনিই ক্ষুদিরাম। তাই তিনি মৃত্যুহীন প্রাণ। সোনার বাংলা মায়ের বীর সন্তানের স্বদেশ প্রেমকথা আজও ধ্বনিত।

অনুশীলনী

১। "ক্ষুদিরাম" নাম রাখা হয়েছিল কেন ?

২। ক্ষুদিরামের সঙ্গী ছিলেন কে ?

৩। ক্ষুদিরাম কার দ্বারা বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত হন ?

৪। যেটি ঠিক উত্তর তার পাশে ✓ এই চিহ্ন দাও :

(ক) ক্ষুদিরাম নির্ভীক ছিলেন না।

(খ) ক্ষুদিরাম নির্ভীক ছিলেন।

৫। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) একবার বিদায় দে ····
······ দেখবে ভারতবাসী।

(খ) দশ মাস দশ দিন পরে
··· ··· ··· ··· ··· ···

———



শহীদ প্রফুল্ল চাকী

ক্ষুদিরামের বিচার চলছিল। মজঃফরপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ উডম্যানের নিকট হাজির করা হল ক্ষুদিরামকে।

প্রশ্ন করা হল, "ঐ মৃতদেহ চিনতে পার ?"

ক্ষুদিরাম উত্তর দিলেন—হ্যাঁ, চিনি, এটি দীনেশ রায়েরই শব। দীনেশ রায় নামে যিনি পরিচিত হয়েছিলেন তার প্রকৃত নাম প্রফুল্ল চাকী।

প্রফুল্ল চাকী অল্প বয়সেই বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ক্ষুদিরামের সাথে তাকে মজঃফরপুরে পাঠানো হয় কিংসফোর্ড সাহেবকে হত্যা করবার জন্য। ওখানে বোমা নিক্ষেপের পর তিনি পালাবার চেষ্টা করেন। মজঃফরপুর থেকে প্রফুল্ল পায়ে হেঁটে সমস্তিপুরে এসে পৌঁছোন এবং সেখানে একখানা নতুন কাপড় ও একজোড়া নতুন জুতো কিনে বেশ পরিবর্তন করেন।

এই সময় প্রফুল্ল একজন পুলিস সাব-ইন্সপেক্টরের নজরে পড়েন। কিন্তু তিনি তখন তা বুঝতে পারেন নি। ঐ পুলিশের নাম নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি রাঁচিতে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। প্রফুল্লর প্রতি সন্দেহ হওয়াতে নন্দলাল গাড়িতে তাঁর সাথে বসে পড়ল। পুলিশের লোক খুব চালাক। তাই নন্দলাল প্রফুল্লর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ জমিয়ে নিল। এমন কি রাজনৈতিক মত ও সংবাদের কথা এমনভাবে বলতে লাগল যাতে প্রফুল্ল মনে করলেন ইনিও আমার মতাবলম্বী। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন নি সে পুলিশের লোক। সে তাঁর সাথে শঠতা করছে।

ফেরি স্টীমারে নন্দলাল ও প্রফুল্ল ঘাটে পৌঁছালেন। তখন প্রফুল্ল নন্দলালকে বন্ধুর মত মনে করেছিলেন। তাই তিনি নন্দলালের জিনিসপত্র কাঁধে নিয়ে রেল ষ্টেশনে হাজির হলেন।

কিন্তু হায় দুর্ভাগ্য! প্রফুল্ল রেল প্লাটফর্মে আসামাত্র নন্দলাল একজন পুলিশকে হুকুম দিল—"একে গ্রেপ্তার কর।"

প্রফুল্ল অবাক! এ কি হল! তিনি হলেন বিভ্রান্ত ও বিহ্বল। তিনি দীপ্তকণ্ঠে বলে উঠলেন—"তুমি বাঙালী হয়ে আমায় গ্রেপ্তার করছ?"

পুলিশ কনষ্টেবল পিছন থেকে প্রফুল্লকে ধরে ফেলেছিল। কিন্তু প্রফুল্ল পুলিশটাকে সবলে মাটিতে ফেলে দিলেন। পরক্ষণেই তিনি পিস্তল বের করে প্লাটফর্মের অপর দিকে কয়েক পা হেঁটে গেলেন।

তখনই আর একজন পুলিশ এসে পড়ল তাঁকে ধরবার জন্য। প্রফুল্ল এই পুলিশের দিকে পিস্তল থেকে গুলি ছুড়লেন। কিন্তু ব্যর্থ হল। গুলি তার গায়ে লাগল না।

এদিকে আগের পুলিশটা এগিয়ে এল। প্রফুল্ল দেখলেন

পালাবার আর উপায় নেই। তখন পিস্তলটাকে নিজের গায়ের দিকে তাক করলেন। ছুড়লেন পর পর দুটো গুলি। প্রথম গুলিটা লাগল তাঁর বুকে আর দ্বিতীয় গুলিটা লাগল তার চিবুকে। সাথে সাথে প্রফুল্ল অন্তিম শয়নে শায়িত হলেন মাটিতে। শহীদ হলেন প্রফুল্ল চাকী।

নির্ভিক তরুণের দেশের জন্য এই আত্মদান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে আছে। তাঁর আত্মদানের কাহিনী অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে কত শত তরুণকে। তিনি অমর হয়ে আছেন আমাদের মাঝে।

অনুশীলনী

১। প্রফুল্ল চাকী কি বিপ্লবী ছিলেন?

২। প্রফুল্ল চাকী কার সহকর্মী ছিলেন?

৩। প্রফুল্ল চাকীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল কে?

৪। প্রফুল্ল চাকী কোথায় আক্রান্ত হন?

৫। তিনি শহীদ হলেন কি করে?



শহীদ সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও কানাইলাল দত্ত

ক্ষুদিরামের মাষ্টার মশাই, বিপ্লবী যুগের অন্যতম নায়ক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তিনি ছিলেন অগ্নিযুগে শ্রীঅরবিন্দের সময়ের বিপ্লবী। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন অমায়িক ও সত্যবাদী।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম হয় মেদিনীপুরে। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করবার পর তিনি কলকাতায় সিটি কলেজে পড়াশুনা করেন। এই সময় তাঁর অসুখ হয় এবং স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য তিনি বাইরে চলে যান।

পরবর্তী সময়ে তিনি মেদিনীপুরের কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করেন। এইসময় তিনি মেদিনীপুর জেলার

ভারপ্রাপ্ত বিপ্লবী নেতা ছিলেন। তিনি তরুণদের দীক্ষিত করলেন বিপ্লবী সৈনিকব্রতে ক্ষুদিরাম তখন ছিলেন তাঁর প্রিয় শিষ্য।

মেদিনীপুর শহরের এক প্রান্তে সত্যেন্দ্রনাথ গড়ে তুললেন এক বিপ্লবী সমিতি। তাঁর সহকর্মী ছিলেন কানাইলাল দত্ত ও হেমচন্দ্র কানুনগো।

কানাইলাল দত্ত ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন এখানে ডুপ্লে কলেজের ছাত্র। এই কলেজের শিক্ষক ছিলেন চারুচন্দ্র রায়। তিনি ছিলেন একজন বিপ্লবী। কলেজের বহু ছাত্র তাঁর কাছ থেকে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত হন। কানাইলাল দত্ত ছিলেন এঁদের মধ্যে অন্যতম।

ক্ষুদিরামের ফাঁসির পর ইংরেজ সরকার বিপ্লবীদের ঘাঁটি খোঁজ করতে লাগল। তারা মানিকতলায় বোমার কারখানা আবিষ্কার করল। তারা সেখানে গ্রেপ্তার করল সত্যেন্দ্রনাথ বসু, কানাইলাল দত্ত, নরেন গোঁসাই, বারীন ঘোষ ও আরও অনেককে। এঁদের কারাগারে আবদ্ধ করা হল।

এই সময় নরেন গোঁসাই ইংরেজ সরকারের পক্ষে যোগ দেন এবং পুলিশের কাছে বিপ্লবীদের সব গোপন কথা ফাঁস করে দেন।

বিপ্লবীরা দেখলেন সর্বনাশ! এখন কি করা যায়। তাঁরা ঠিক করলেন এর প্রতিশোধ নিতেই হবে। সত্যেন্দ্রনাথ কানাইলালের সাথে পরামর্শ করে জেলের মধ্যে আনালেন দুটো রিভলভার।

জেলের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের যখন অসুখ হয় তখন তাঁকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নেওয়া হয়।

এই সময় কানাইলালও অসুখের ভান করে ঐ হাসপাতালে এসেছেন।

হাসপাতালে পুলিশের কাছে তিনি বললেন, আমিও নরেনের মত বিপ্লবীদের গোপন কথা ফাঁস করে দেব। তাই নরেনের সাথে আমার দেখা হওয়ার দরকার।

পুলিশ কর্তৃপক্ষ একথা শুনে খুবই খুশী। তারা নরেনকে পাঠিয়ে দিল হাসপাতালে। নরেনের সাথে কথা বলতে বলতে সত্যেন্দ্রনাথ রিভলভার থেকে গুলি ছুড়লেন নরেনের দিকে।

গুলি খেয়ে পালাতে গেলেন নরেন। তখনই সত্যেন্দ্রনাথ তার পিছু ধাওয়া করলেন। এদিকে কানাইলালও সিঁড়ির নিচে ওত পেতেছিলেন। তিনি গুলি ছুড়লেন নরেনের দিকে। গুলি খেয়ে বিশ্বাসঘাতক নরেনের মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। বিশ্বাস ঘাতকের শাস্তি বিধান করলেন সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলাল। এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ল জেলের মধ্যে। বেজে উঠল পাগলা ঘণ্টা। কিন্তু জেলার বা পুলিশ কেউই প্রথমে এগোতে সাহস পায় নি।

এরপর সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এসে সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাই লালকে বন্দী করল।

আলিপুরের আদালতে বিচার শুরু হল। সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে মামলায় নিযুক্ত হলেন একজন ব্যারিষ্টার ও একজন উকিল। কিন্তু কানাইলাল কোন উকিল দিতে রাজী হলেন না। শুরু হল তাঁদের বিচার।

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বললেন, "দোষ আমারই। কারণ নরেনকে আমিই খুন করেছি।"

এদিকে কানাইলালও বলে উঠলেন, "না, ও নয়, আমিই গুলি করেছি, আমিই দোষী।"

খুনের অপরাধে ফাঁসির হুকুম হল কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথ দুজনেরই।

১৯০৮ সালের ১০ই নভেম্বর। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের ফাঁসির মঞ্চে হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালেন কানাইলাল। মুহূর্তের মধ্যেই সব শেষ!

এদিকে সত্যেন্দ্রনাথের আপীল হয়েছিল ছোটলাটের দরবারে। তাই ফাঁসির দিন পিছিয়ে গিয়েছিল।

১৯০৮ সালের ২৩শে নভেম্বর। স্থান আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল। সত্যেন্দ্রনাথের জীবনের অবসান হল ফাঁসির মঞ্চে।

সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলালের মত দেশপ্রেমিকের মৃত্যু নেই। যতদিন বাঙলা থাকবে, বাঙালী থাকবে, ততদিন সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলাল অমর।

অনুশীলনী

১। সত্যেন্দ্রনাথ কখন এবং কোথায় বিপ্লব কাজে লিপ্ত ছিলেন ?

২। তাঁর প্রিয় শিষ্য ছিলেন কে ?

৩। সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলাল নরেন গোঁসাইকে খুন করলেন কেন ?

৪। সত্যেন্দ্রনাথ আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কি বলেছিলেন ?

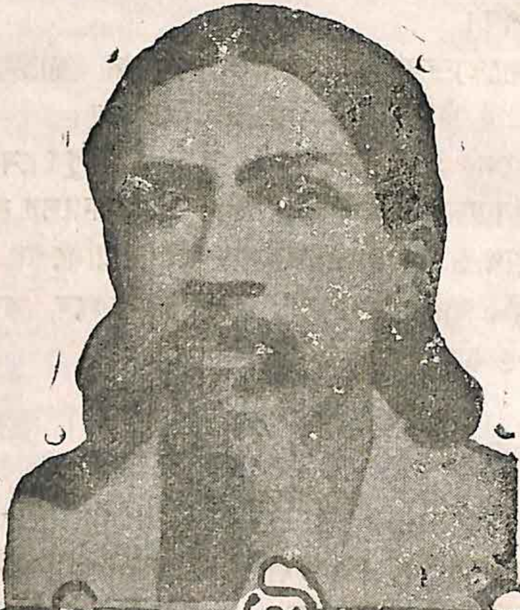
৫। কানাইলাল আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কি বলেছিলেন ?

৬। যেটি ঠিক তার পাশে ✓ এই চিহ্ন দাও :

(ক) কানাইলাল রাজসাক্ষী হয়ে বিপ্লবীদের কথা ফাঁস করে দিলেন।

(খ) নরেন গোঁসাই রাজসাক্ষী হয়ে বিপ্লবীদের কথা ফাঁস করে দিলেন।

৭। সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলাল কি ভাবে নরেন গোঁসাইকে খুন করেন ?



অগ্নিযুগের শ্রীঅরবিন্দ

স্থান কলকাতার গ্রে ষ্ট্রীটের একটা বাড়ি। "তুমিই অরবিন্দ"। বলে উঠল কলকাতা পুলিশের কুখ্যাত অফিসার টেগার্ট সাহেব। এই সময় ইংরেজ সরকার বোমার খোঁজে সারা বাঙলা তোলপাড় করতে লাগল। টেগার্ট বিরাট পুলিশ বাহিনী নিয়ে এসেছিল গ্রেপ্তার করতে, একজন বিপ্লবীকে ধরবার জন্য। কিন্তু এসে দেখে একজন সাদাসিধে মানুষ। ইনিই অরবিন্দ ঘোষ বিপ্লবীদের গুরু।

১৮৭২ সালের ১৫ই আগস্ট অরবিন্দ ঘোষের জন্ম হয় কলকাতায় থিয়েটার রোডের বাড়িতে। তাঁর বাবার নাম ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ, মায়ের নাম স্বর্ণলতা দেবী। তাঁর ছোট ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

অরবিন্দ বাল্যকাল থেকেই বিলেতে শিক্ষালাভ করেন। এখানে তিনি আই. সি. এস. পরীক্ষায় সব বিষয়ে পাশ করেন। কিন্তু ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষায় তিনি ইচ্ছে করেই হাজির হলেন না। কারণ তিনি ইংরেজের দেওয়া খেতাবটা নেওয়া পছন্দ করলেন না। এরপর তিনি স্বদেশে ফিরে বরোদার রাজ সরকারে চাকরি নিলেন। এখানে ভারত ভগিনী নিবেদিতার সাথে তাঁর পরিচয় হয়। নিবেদিতা তাঁকে দেখে বুঝে ছিলেন ইনিই বাঙলার কর্ণধার হবার মত যোগ্য ব্যক্তি। তাই নিবেদিতা অরবিন্দকে বাঙলার বিপ্লবী মাটিতে দেশের কাজের জন্য আহ্বান করলেন। অরবিন্দ এলেন কলকাতায়। ১৯০৫ সালে ইংরেজ শাসক লর্ড কার্জন বঙ্গ-ভঙ্গ আইন পাশ করলেন। এই বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন বাংলার মানুষ। এই বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন বাংলার এই মানুষটি। নেতৃত্ব দিলেন অরবিন্দ! তুমুল আন্দোলনের ফলে রদ হল বঙ্গ-ভঙ্গ। তখন বাঙলার মানুষ ভারত স্বাধীন করবার জন্য পাগল। অরবিন্দ বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন তরুণদের। বিপ্লবীরা মাণিকতলায় গোপন আস্তানা গড়লেন। বোমা তৈরীর কৌশল শিক্ষা করে এলেন বিদেশ থেকে হেমচন্দ্র কানুনগো। এখানে মিলিত হলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত, উল্লাসকর দত্ত, প্রমুখ বিপ্লবীরা।



ভগিনী নিবেদিতা

অরবিন্দ প্রতিষ্ঠা করলেন বন্দে-মাতরম্ পত্রিকা। তাতে কয়েকটা রাজদ্রোহমুলক প্রবন্ধ-থাকায় বন্দেমাতারম্ পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা আনল ইংরেজ সরকার। পত্রিকার সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পালকে ডাকা হল কোর্টে সাক্ষী দিতে। তখন

কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোড সাহেব। বিপিনচন্দ্র কোর্টে হাজির হয়ে বললেন, "এ মামলায় কোর্টের কোন প্রশ্নেরই আমি জবাব দেব না এবং শপথও নেব না। কারণ এই মামলা স্বাধীনতার স্বার্থ বিরোধী।"

আদালত অবমাননার দায়ে ছ'মাস কারাদণ্ডের আদেশ হল বিপিনচন্দ্রের। তখন বাইরে জনতা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে লাগল। তখন শ্বেতাঙ্গ সার্জেণ্টরা মানুষের ওপর বেটনের আঘাত শুরু করল। এই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে পনের বছরের একটা ছেলে পুলিশের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে আঘাত হানতে লাগল। কিন্তু সে হল গ্রেপ্তার। তার সাজা হল পনেরো ঘা বেত্রদণ্ডের।

তখন কবি গান বাঁধলেন—

বেত মেরে কি মা ভোলাবি,
আমরা কি মা'র সেই ছেলে ?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
তখন কে পালাবে মা ফেলে ?

তখন কিংসফোর্ডকে নিধন করবার জন্য একটা 'বই বোমা' তার আফিসে রাখা হয়েছিল। কিন্তু কিংসফোর্ড মজঃফরপুরে বদলি হয়ে যান এবং ঐ বোমা পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

এদিকে অরবিন্দ 'বন্দে-মাতরম্' পত্রিকায় লিখলেন, 'পূর্ণ স্বাধীনতা চাই।" ভারতের মধ্যে অরবিন্দই প্রথম নির্ভয়ে ঘোষণা করেন 'পূর্ণ স্বাধীনতা'। মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ 'বন্দে-মাতরম্ পত্রিকায় লিখলেন, "অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার। হে বন্ধু! হে দেশবন্ধু! স্বদেশ আত্মার বাণী মূর্তি তুমি।"

১৯০৮ সালের ৫ই মে। অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করল ইংরেজ সরকার। আলিপুর বোমারমামলার আসামী হিসেবে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হল আলিপুর জেলে।

বিচারালয়ে তাঁর পক্ষ নিলেন বিখ্যাত তরুণ



ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় অরবিন্দ মামলা থেকে মুক্তি পেলেন। চিত্তরঞ্জন হলেন খুব খুশী।

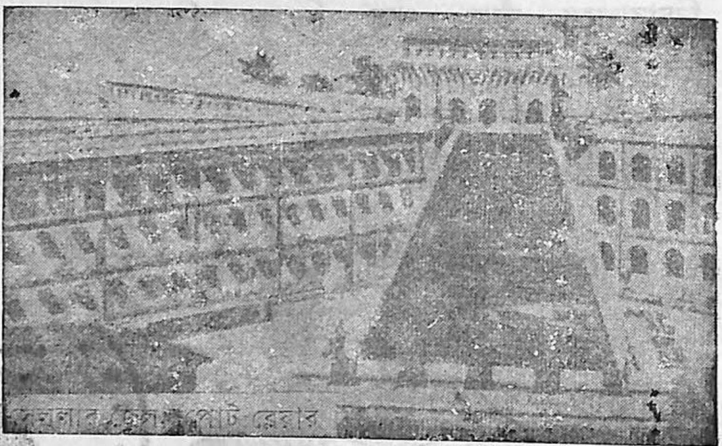
আলিপুরের নির্জন কারাগারে থেকে তাঁর মনে জেগে উঠল দিব্য অনুভূতি। তিনি হলেন শ্রীঅরবিন্দ।

আলিপুর আদালতে রাজদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন বারীন ঘোষ, কানাইলাল দত্ত, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, আরও অনেকে।

বারীন ঘোষ সহ চারজনকে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত করা হল। তাঁদের সেখানে রাখা হল কুখ্যাত সেলুলার জেলে।

তারপর শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে গিয়ে সাধনায় মগ্ন হন।

তিনি হলেন ঋষি অরবিন্দ। ১৯৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বর তিনি পার্থিব দেহ ত্যাগ করেন।



আন্দামানে সেলুলার জেল

অরবিন্দ অনেক আগেই ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন, ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হবে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হল তাঁরই জন্ম দিন ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট।

তাঁর রচিত 'সাবিত্রী' ও লাইফ ডিভাইন (দিব্য জীবন) এ যুগের দু'খানা শ্রেষ্ঠ বই।

অনুশীলনী

১। নিচের যে বাক্যটি ঠিক তার পাশে ✓ এই চিহ্ন দাও:

(ক) শ্রীঅরবিন্দ কলকাতায় লেখাপড়া শেখেন।

(খ) শ্রীঅরবিন্দ বিলেতে লেখাপড়া শেখেন।

২। শ্রীঅরবিন্দ বিপ্লবী আন্দোলনে কখন যোগ দেন ?

৩। 'বঙ্গ-ভঙ্গ' আন্দোলন কি ?

৪। ভগিনী নিবেদিতার সাথে শ্রীঅরবিন্দের কোথায় দেখা হয় ?

৫। নিবেদিতা শ্রীঅরবিন্দকে কি বলেছিলেন ?

৬। কলকাতায় বিপ্লবীদের আস্তানা ছিল কোথায় ?

৭। "অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার। হে বন্ধু! হে দেশবন্ধু! স্বদেশ আত্মার বাণী মূর্তি তুমি"। একথা কে লিখেছিলেন ? কেন লিখেছিলেন ?

৮। ভারতের মধ্যে 'পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী' সর্বপ্রথম কে ঘোষণা করেন ?

৯। কোন মামলায় শ্রীঅরবিন্দ গ্রেপ্তার হন ?

১০। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ কি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ?

———

ঘর-শত্রু-বধ পালা

অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা যখন থেকে ইংরেজদের ভারত থেকে তাড়াবার জন্যে সংগ্রাম করছিলেন, তখন এ দেশে অনেক ঘর-শত্রু ইংরেজ পক্ষে যোগদান করেছিল। তারা স্বদেশের মঙ্গলের কথা ভাবে নি। তাদের লোভ ছিল ইংরেজদের কাছ থেকে মোটা পুরস্কার লাভ করা।

এই রকম একজন ঘর-শত্রু ছিল পুলিশ ইনস্‌-পেকটর নন্দলাল ব্যানার্জি। সে বন্ধুত্বের ভান দেখিয়ে প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেপ্তার করতে চেয়েছিল। এই কুকাজের বিচার করতে বিপ্লবীরা ভোলেন নি। কারণ এদের খতম না করতে পারলে ইংরেজের সাথে লড়া যাবে না।

১৯০৮ সালের কথা। নভেম্বর মাসের ৯ তারিখ। রাত তখন প্রায় আটটা। কলকাতার সারপেনটাইন লেন ধরে চলেছেন নন্দলাল। মুখে হাসি। খুশিতে মন ভরা। কারণ বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার মিলেছে। ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন নগদ এক হাজার টাকা।

হঠাৎ দুজন তরুণ এসে তাঁর পথ আগলে দাঁড়ালেন। তাঁরা আগে থেকেই-একটা পুরোনো শিবমন্দিরের আড়ালে দাড়িয়ে চীনেবাদাম খাচ্ছিলেন। শিকার সামনে দেখে তাঁরা এগিয়ে এসেছেন। চোখে-মুখে তাঁদের আগুনের ঝলকা। প্রতিশোধের আগুন।

দুজনকে দেখে চকিত হলেন নন্দলাল। ভয়মেশানো কণ্ঠে তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন নন্দলাল,

"কে তোমরা ? কি চাও ?"

উত্তর এল, "চাই তোমায় নতুন করে পুরস্কার দিতে।" আর দেরী নয়, সাথে সাথে গুড়ুম্! গুড়ুম্! গুড়ুম্! আওয়াজ উঠল। পর পর রিভালবারে তিনটে গুলি।

তিন গুলি খেয়েই নন্দলালের ইহজীবনের শেষ! মাটিতে লুটিয়ে পড়ল তার রক্তাক্ত দেহ।

সঙ্গে সঙ্গে দুই তরুণ উধাও। অনেক চেষ্টা করেও পুলিশ তাঁদের কোন হদিস করতে পারে নি।

এই দুই তরুণ ছিলেন শ্রীশ পাল আর রনেন গাঙ্গুলি।

এর পরের ঘটনা।

ঐতিহাসিক আলিপুর বোমার মামলা। সরকার পক্ষের দু'জন বিশ্বাসঘাতক। এদের কাজ ছিল বিপ্লবীদের কি করে ধরিয়ে দেওয়া যায়। কি করে সাজা দেওয়া যায়। এদের একজন আশুতোষ বিশ্বাস আর একজন শামসুল আলম।

বিপ্লবীরা এদেরও বিচার করবেন ঠিক করলেন।

১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারি।

কলকাতার পুলিস আদালত থেকে সবেমাত্র বাইরে এসেছেন আশুতোষ বিশ্বাস। হঠাৎ রিভলবারে গর্জন। পরপর তিনটে শব্দ। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল বিশ্বাস মশাইয়ের মৃতদেহ।

আততায়ী সাথে সাথেই ধরা পড়লেন। নাম তাঁর চারুচন্দ্র বসু। খুলনার শোভনা গ্রামের কেশব বসুর ছেলে। তিনি কাজ করতেন "হিতৈষী প্রেসে।"

পুলিশ চারুচন্দ্রকে দেখে তো অবাক। তাঁর ডান হাত পক্ষাঘাতে পঙ্গু। সেই হাতেই বাঁধা রয়েছে একটা রিভালবার। বাঁ হাতেই ট্রিগার টিপে গুলি ছুড়েছিলেন তিনি। একেবারে অদ্ভুত! অবিশ্বাস্য।

আদালতে মামলা শুরু হল চারুচন্দ্রের। আদালতে তিনি বলে উঠলেন, বিচারের দরকার নেই। কালই আমার ফাঁসি হোক। আশুবাবু দেশের শত্রু। তাই আমি তাকে নিধন করেছি। এর শাস্তি ফাঁসি। আমি তা জানি।

বিচারে চারুচন্দ্রের ফাঁসির হুকুম হল। তাঁকে অনেক অনুরোধ করা হল লাটের দরবারে আপীল করতে। কিন্তু তিনি রাজি হলেন না।

অবশেষে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে ১৯০৯ সালের ১৯শে মার্চ চারুচন্দ্রের ফাঁসি হল।

এরপর শামসুল আলমের পালা।

সেদিন ১৯১০ সালের ২৪শে জানুয়ারি। হাইকোর্টের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে শামসুল আলম। এমন সময় কার হাতের রিভালবার গর্জে উঠল। শব্দ হল গুড়ুম্! গুড়ুম্! আলম সাহেবের গুলিবিদ্ধ দেহটা সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

হাইকোর্ট জুড়ে ভীত সন্ত্রস্ত লোকের ছুটোছুটি॥

সশস্ত্র পুলিশ ধুবা সিং ছিল কাছেই। আততায়ীকে ধরবে বলে সে পা বাড়িয়েছে। অমনি আর একবার পিস্তলের আওয়াজ! 'রাম' 'রাম' বলতে বলতে পালাল ধুবা সিং।

কিন্তু পিস্তলের গুলি তখন শেষ। বীরবিক্রমে এগিয়ে এল হাইকোর্টের দুই চাপরাসী—রামঅধীন সিং, রামজানি সিং।

ধরা পড়লেন বীরেন দাসগুপ্ত। তাঁর বয়স তখন মাত্র উনিশ। বাড়ি ছিল তাঁর ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে।

আদালতে বিচার শুরু হল। বীরেন কোন উকিল দিলেন না। তিনি নিজেই বললেন, "আমি ওকে হত্যা করেছি। আর কিছু বলার নেই।"

শেষ অবধি আদালতের রায় বেরল, অততায়ীর শাস্তি ফাঁসিতে মৃত্যু।

ফাঁসির রশিতে শহীদের সংখ্যা বাড়ল আরো একটি। সেদিন ছিল ১৯১০ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি।

অগ্নিযুগের ইতিহাসে এমনি আরো কত শহীদের নাম ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়। তাঁরা বিশ্বাসঘাতকদেরও ইংরেজদের পা-চাটা লোকদের সাজা দেবার জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। বিপ্লবের পথে এর গুরুত্ব ছিল খুবই বেশী। সেই গুরুত্ব চিরস্মরণীয়। আর চিরস্মরণীয় এই অমর বীর শহীদের দল। যাঁদের আদর্শ উদ্বুদ্ধ করে দেশের মানুষকে, স্বদেশকে ভাল বাসতে।

অনুশীলনী

১। দেশকে ভালবাসত কাঁরা ?

২। বিপ্লবীরা নন্দলালকে হত্যা করলেন কেন ?

৩। চারুচন্দ্রের ডান হাত পঙ্গু ছিল কি ?

৪। চারুচন্দ্র শামস্থল আলমকে হত্যা করলেন কি করে ?

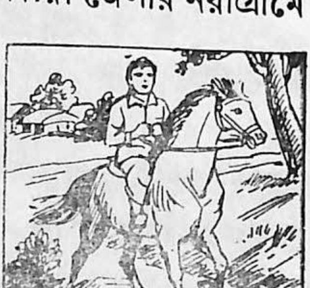
৫। বিপ্লবীরা দেশের লোককে মেরেছিলেন কেন ?



মহানায়ক বাঘা যতীন

বীর সৈনিক বাঘা যতীন। তাঁর শক্তি ছিল অসাধারণ। ব্যবহার ছিল অতি মধুর! সঙ্গী সাথীদের প্রতি ছিল তাঁর অসাধারণ সহানুভূতি। তিনি বিপ্লবী বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ নেতা। তাঁর আসল নাম যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি প্রথম যৌবনে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে একটা বাঘ মেরে "বাঘা যতীন" নামে খ্যাত হ'ন।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর নদীয়া জেলার নয়াগ্রামে যতীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। শ্রীঅরবিন্দের সময়েই যতীন্দ্রনাথ বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। এই সময় তিনি সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি ঘোড়ায় চড়ে গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে বেড়াতেন। উদ্দেশ্য ছিল তরুণদের সংগঠিত করা, বিপ্লবী, সংগ্রামকে জোরদার করা।



আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার পর শ্রীঅরবিন্দ রাজনীতি থেকে সরে যান। তখম বিপ্লবীদের নেতৃত্ব দেন যতীন্দ্রনাথ।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর বীরেন্দ্রনাথ দত্ত নামে এক কিশোর বিপ্লবী কলকাতা হাইকোর্টের মধ্যে এক গোয়েন্দা অফিসারকে হত্যা করেন। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে খুব মারধোর করে। ফলে বীরেন্দ্রনাথ বলে দেয় বিপ্লবীদের নেতা বাঘা যতীনের নাম।

পুলিশ যতীন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ না পেয়ে পুলিশ তাঁকে ছেড়ে দেয়।

এই সময় বাংলার বিপ্লবের এক নতুন যুগ। শুরু হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। বিপ্লবীরা ভারতের বিভিন্ন স্থান ও বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

মানবেন্দ্র রায়কে পাঠান হল বিদেশে। ঠিক হল এক জাহাজ অস্ত্র ও অনেক টাকা বিদেশ থেকেআসবে। বিপ্লবীরা সেই জাহাজ থেকে অস্ত্র নিয়ে সারা ভারতোবপ্লবীদের কাছে পৌঁছে দেবেন। ঘর থেকে বেরোবার আগে তাঁর দিদি তাঁর কপালে ভাই ফোঁটা দিয়ে জয়টীকা পরিয়ে দিলেন।

পরিকল্পনা পাকা। যতীন্দ্রনাথ তাঁর চার সঙ্গী মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, জ্যোতিষ পাল, নীরেন দাসগুপ্ত ও চিত্তপ্রিয় রায়-চৌধুরীকে নিয়ে হাজির হলেন উড়িষ্যার বালেশ্বরে। ওখানে মহানদীর মোহনায় বুড়িবালাম নামক জায়গায় তাঁরা রইলেন জাহাজ আসার অপেক্ষায়।

কিন্তু ভাগ্যবিধাতা বিরূপ। কারণ সেই অস্ত্র বোঝাই-জাহাজ চীনের সাংহাই বন্দরে আটকে পড়েছে। বিপ্লবীরা তা জানতে পারেন নি। তাঁরা অপেক্ষা করেই আছেন

সমুদ্র পানে চেয়ে। ঘন ঘন দুরবীণ চোখে দিয়ে দেখছেন জাহাজ আসে কি না।

এদিকে মহা বিপদ। ইংরেজ পুলিশ এ'দের কথা জেনে ফেলেছে। কলকাতার পুলিশ কমিশনার পাঁচ শত সৈন্য নিয়ে মাত্র পাঁচ জন বাঙ্গালীকে ধরতে গেলেন।

কলকাতা থেকে সেই কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার চাল'স টেগার্ট একদল বিরাট সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী নিয়ে যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীদের আক্রমণ করল।

এই বিরাট পুলিশ বাহিনী দেখে যতীন্দ্রনাথ বললেন, আমরা মাত্র পাঁচটি বাঙ্গালী। আমাদের ধরবার জন্য এতবড় পুলিশ বাহিনী। এই ভীরু ইংরেজ দল কি করে আমাদের এত বড় দেশ শাসন করছে।"

দিনটা ছিল ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর। বিপ্লবীরা মাটিতে ট্রেঞ্চ (গর্ত) খুঁড়ে তার মধ্যে লুকিয়ে থেকে পুলিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন।

তাঁরা ভয় পেলেন না একটুও। তাঁরা ঠিক করলেন কিছুতেই ধরা দেবেননা। বাঘা যতীন বললেন, "শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাও"। আদেশ দিলেন "ফায়ার"।

এই যুদ্ধে অসংখ্য ইংরেজ সৈন্য নিহত হল। কিন্তু তাঁদের গুলি ফুরিয়ে গেল। গুলি থাকলে বোধ হয় বাকী ইংরেজ সৈন্যও খতম হয়ে যেত। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ।

সেই ঐতিহাসিক স্থান—বুড়িবালামের তীর বিপ্লবী তরুণদের রক্তে লাল হয়ে গেল।

পরিখার যুদ্ধে ঘটনা স্থলেই মারা যান চিত্তপ্রিয়। বাঘা যতীনকে দারুন আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া হল।

তখন তিনি প্রায় মৃত্যুর কোলে। পরের দিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন সিংহ-বীর-বিপ্লবী বাঘা যতীন।

জ্যোতিষ পাল আন্দামানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করার কালে পাগল হয়ে মারা যান। নীরেন আর মনোরঞ্জন হাসিমুখে প্রাণ দিলেন ফাঁসির মঞ্চে!

কবি সত্যেন্দ্রনাথ নির্ভীক বাঙালী তরুণদের বীরত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে লিখলেন—

"বুড়িবালামের তীরে
বুকের শোনিতে তোমরা রাঙালে ধরিত্রীরে।"

স্বাধীনতা সংগ্রামে এই যুদ্ধই হল ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রথম সম্মুখ যুদ্ধ। এ যুদ্ধ বাঙালীর শৌর্যের এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্বদেশের জন্য এই আত্মত্যাগের আদর্শে আমাদের উদ্বুদ্ধ হওয়া উচিত। তবেইতো তাঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানান হবে।

অনুশীলনী

১। নীচের কোন বাক্যটি ঠিক তার পাশে ✓ এই চিহ্ন দাও :

(ক) বাঘা যতীনের জন্ম হয় কলকাতায়।

(খ) বাঘা যতীনের জন্ম হয় নদীয়া জেলার নয়াগ্রামে।

২। বাঘা যতীনের আসল নাম কি?

৩ তাঁর নাম বাঘা যতীন হল কেন?

৪। তিনি বিপ্লবীদের নায়ক হন কখন ?

৫। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার জন্য তিনি কি ব্যবস্থা নেন।

৬। বাঘা যতীনের সহযোদ্ধা কারা ছিলেন ?

৭। কোন ব্রিটিশ পুলিশ অফিসার এঁদের সাথে যুদ্ধ করেন ?

৮। পরিখা কি ?

৯। কোন কবি বিপ্লবীদের গুণগান করেন ?

১০। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) —— তীরে।

(খ) —— তোমরা —— ধরিত্রীরে।

———



বিপ্লবী নায়ক
রাস বিহারী বসু

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা সাড়া দিয়েছিলেন রাসবিহারী বসু তাঁদের অন্যতম। তিনি মহাবিপ্লবী।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার সুবলদহ গ্রামে রাসবিহারী বসুর জন্ম হয়। শৈশবে তিনি খেলাধুলো এবং লেখাপড়ায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। ক্রমে এই সিংহ শাবক বড় হয়ে সারা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেন।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সরকারী চাকরি নিয়ে দেরাদুনে যান। এর আগে থেকেই তিনি বিপ্লবী দলে যোগ দেন।

এই সময় ভারতের মুক্তি সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করার জন্য বিদেশ থেকে অর্থ এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার কাজ চলছিল। একাজের জন্য বিপ্লবীরা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন।

রাসবিহারী বসু চাকরি করবার সময় খুব নিষ্ঠার সাথে কাজ করতেন। তাই তিনি যে বিপ্লব কর্মের সাথে যুক্ত একথা ইংরেজ সরকার সন্দেহ করত না। এই সময় চন্দন-

নগরের বিপ্লবী সংঘ ও ঢাকার অনুশীলন সমিতির সাথে তাঁর যোগাযোগ হয়। তিনি অফিসে কাজ করবার সময় বিপ্লবের কর্মপন্থা ঠিক করতে থাকেন।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে রাসবিহারী ও নদীয়া জেলার বসন্ত বিশ্বাস একটা দুঃসাহসিক কাজ করেন। তখন ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছে কলকাতা থেকে দিল্লীতে। বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ শোভাযাত্রা করে যাচ্ছেন লাটসাহেবের প্রাসাদে। পথের দুধারে অজস্র লোক তা দেখছেন। এই ভিড়ের মধ্যে বসন্ত বিশ্বাসের সাথে বোমা হাতে দাঁড়িয়েছিলেন রাসবিহারী। বড়লাটের গাড়ি সামনে এল। অমনি বোমা ছুড়লেন বসন্ত বিশ্বাস সেই গাড়ির ওপর। বোমার আঘাতে একজন ছত্রধারী নিহত হল। বড় লাট ও তাঁর স্ত্রী আহত হলেন।

এই সাংঘাতিক ঘটনার পরেও পুলিশ রাসবিহারী বসুকে ধরতে পারে নি। কারণ তখনও পুলিশ তাঁর নাম জানত না। এর পর লাহোরের পুলিশ ক্লাবে এবং সহকারী পুলিশ কমিশনারকে লক্ষ্য করে বিপ্লবীরা বোমা নিক্ষেপ করেন। তখন পুলিশ জানতে পারল এই বিপ্লবীদের নায়ক রাসবিহারী বসু। নাম প্রকাশ হয়ে পড়া মাত্র তিনি দেরাদুন ছেড়ে উত্তর ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিপ্লবী কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে থাকেন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ইংরেজরা ভীষণভাবে বিব্রত হয়ে পড়ল এই যুদ্ধে। রাসবিহারী দেখলেন, এই তো সুযোগ! এই সময় বাঘা যতীনের সাথে তাঁর যোগাযোগ হয়। তাঁরা সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

বিপ্লবের এক নতুন যুগ শুরু হল। রাসবিহারী বসু যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ নেতারা মিলিত হলেন বিপ্লব কর্মে।

১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী ছিল গণঅভ্যুত্থানের নির্দিষ্ট দিন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সব বিফল হয়ে গেল। কৃপাল সিং নামে এক গুপ্তচর সব খবর ফাঁস করে দিল।

বোমা সমেত ধরা পড়লেন অনেকে। বিদ্রোহী সৈন্যদলগুলো ভেঙ্গে দেওয়া হল। বিপ্লবীদের অনেকে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিলেন। অনেকে নির্বাসিত হলেন আন্দামানে। দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরূপে রাসবিহারী বসুর প্রাণদণ্ডের আদেশ হল।

ব্রিটিশ পুলিশ রাসবিহারীকে কিন্তু ধরতে পারে নি। তিনি বিদেশে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। জাপানে পড়তে যাবার অছিলায় পি. এন. ঠাকুর ছদ্ম নামে জাহাজের টিকিট কিনলেন। একজন বিপ্লবী সহকর্মী তাঁকে জীপ গাড়িতে করে জাহাজঘাটায় পৌঁছে দিলেন।

রাসবিহারী জাহাজে বসে খবরের কাগজের দিকে চেয়ে আছেন যাতে চোখেমুখে কোন ভয়ের ছাপ না পড়ে। একজন সাহেব পুলিশ এসে টিকিট পরীক্ষা করে বলেন, "ঠিক হ্যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংসারের লোক।"

জাহাজ কলকাতা ছেড়ে বঙ্গোপসাগর পেরিয়ে গেল। তখন ব্রিটিশ পুলিশ জানতে পারল রাসবিহারী বসুর অন্তর্ধানের খবর। কিন্তু তখন তিনি নাগালের বাইরে। তিনি পৌঁছে গেলেন জাপানে।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের নাগরিক হয়ে রাসবিহারী বসু

এক সম্ভ্রান্ত জাপানী কন্যাকে বিয়ে করেন। তিনি টোকিও শহরে একটা বড় হোটেল খুলে সংসার চালাতে লাগলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাসবিহারী বসু প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে সৈন্যদল গঠন করেন।

১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে নেতাজী সুভাষচন্দ্র জার্মান দেশ হতে জাপানে চলে আসেন। পরে তিনি আজাদ হিন্দ সরকারের নায়ক হন। বিপ্লবী বাঙালী রাসবিহারী বসু হলেন সেই সরকারের উপদেষ্টা।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অমরলোকে প্রস্থান করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবধি রাসবিহারী বসুর ভূমিকা ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

অনুশীলনী

১। রাসবিহারী বসুর বাড়ী কোথায় ছিল ?
২। তিনি প্রথম জীবনে কি করতেন ?
৩। বসন্ত বিশ্বাসের বাড়ি ছিল কোথায় ?
৪। রাসবিহারী বসু বসন্ত বিশ্বাসকে নিয়ে দিল্লীতে কি করেছিলেন ?
৫। "গণঅভ্যুত্থানের নির্দিষ্ট দিন"—এর মানে কি ?
৬। রাসবিহারী বসুর ফাঁসির আদেশ হল কেন ?
৭। তিনি কি ভাবে জাপানে গেলেন ?
৮। পুলিশ তাঁকে ধরতে পারল না কেন ?
৯। জাপানে গিয়ে তিনি কি করলেন ?
১০। নেতাজী সুভাষচন্দ্র কি ভাবে তাঁর সাহায্য পান ?

———



শহীদ গোপীনাথ সাহা

গোপীনাথ ছেলেবেলায় বড় হয়েছেন শ্রীরামপুর শহরে। যখন স্কুলে উঁচু ক্লাসের ছাত্র, তখন তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে। সেজন্য অনেক দুর্ভোগ তাঁকে ভুগতে হয়েছিল।

কিশোর গোপীনাথ ছুটে গিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গের বিধ্বংসী বন্যায় দুর্দশাগ্রস্ত অসহায় ভাই বোনের পাশে।

তিনি মানুষের জন্য মানুষের কর্তব্য পালনে সার্থক ভূমিকায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

ইতিমধ্যে দেশপ্রেমে বলীয়ান, বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন গোপীনাথ।

একদিন হঠাৎ আওয়াজ উঠল ঃ কলকাতার রাজপথে টেগার্টকে খুনের চেষ্টা। গোপীনাথ সাহা ধরা পড়েছেন। কিন্তু টেগার্টের বদলে আর এক সাহেব খুন।

স্বদেশপ্রেমিক গোপীনাথ সেদিন ঠাঁই করে নিয়েছিলেন সেখানে যেখানে ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, বাঘাযতীন প্রভৃতি বিপ্লবীদের জন্য মনের কোনে আসন পাতা ছিল।

ঐ চার্লস্ টেগার্ট ছিল ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের পুলিশ কমিশনার। কলকাতা পুলিশের অতি শয়তান ঐ অফিসারের জুড়ি ছিল না।

সে বিপ্লবীদের দলে দলে আটক রাখত ও জঘন্য অত্যাচার চালাত তাঁদের ওপর। তাই বাংলার বিপ্লবীদের সবচেয়ে ঘৃণিত শিকার ছিল ঐ টেগার্ট।

জানুয়ারী মাস। শীতের সকাল। কুয়াসা দৃষ্টিকে কিছুটা ব্যাহত করছে। কলকাতা শহরে চৌরঙ্গী রোডের এক দিকে অট্টালিকার সারি, অন্যদিকে গড়ের মাঠে সবুজের বিস্তার। কিন্তু এই সাতসকালে হন্ হন্ করে হেঁটে চলেছে কে? মিউজিয়াম ও আর্ট স্কুল বাঁয়ে রেখে কে অমন করে ছুটে চলেছে? এ যে গোপীনাথ।

ঐ তো ঢ্যাঙ্গা ফর্সা শাহেবটা। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে গোপীনাথ পিস্তল তাক করে ট্রিগার টিপলেন। পরপর গুলির আঘাতে ধরাশায়ী হল সাহেব। তবুও বুকের ওপর চেপে বসে আরও কয়েকবার গুলি চালালেন তিনি।

এরপর পালাতে পারলেন না তিনি। পুলিশ তাঁকে ধরে ফেলল।

গোপীনাথের বিচার কোর্টে উঠল। বিচার চলছে। কিন্তু গোপীনাথ উদাসীন শৃংখলিত মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য নিবেদিত প্রাণ চরম উৎসর্গের শেষ মুহূর্ত গণনায় অধীর।

বিচারক যখন তাঁর ফাঁসির আদেশ দিলেন, তখন গোপীনাথ দপ্-করে জ্বলে উঠলেন। বলিষ্ঠ কণ্ঠে তিনি উচ্চারণ করলেন: বড়ই আফশোস, আমার দেশের স্বাধীনতার চরম শত্রু ঐ টেগার্টকে খতম করতে পারি নি।

পয়লা মার্চ ফাঁসির দিন। কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে। গোপীনাথ আপন পবিত্র দেহখানাকে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে দাঁড় করালেন। অপেক্ষার সময় নেই তাঁর। ফাঁসির রজ্জু মালা হয়ে তাঁর কণ্ঠকে আলিঙ্গন করল।

গোপীনাথ চলে গেলেন! কিন্তু বাংলার বুকে অত্যাচারী বৃটিশ শাসন ও তার এক নিকৃষ্ট অনুচর সবার সম্মুখে চিহ্নিত হয়ে রইল।

স্বদেশপ্রেমে আত্মবলিদানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন গোপীনাথ।

১৯২৪ সালের কংগ্রেসের সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক কনফারেন্সে শহীদ গোপীনাথের দেশপ্রেম, বীরত্ব ও আত্মদান নিয়ে সপ্রশংস প্রস্তাব যখন আলোচিত হচ্ছিল, তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রস্তাবটি ছিল দেশবন্ধুর অনুপ্রেরণায় রচিত। প্রস্তাবটি গৃহীত হলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ খুশীতে উচ্ছল হয়ে উঠেছিলেন।

অনুশীলনী

১। গোপীনাথের স্বভাব অল্প বয়সে কেমন ছিল?

২। তিনি কোথাকার লোক ছিলেন?

৩। টেগার্ট সাহেবের আস্তানা ছিল কোথায়?

৪। টেগার্ট সাহেব কে?

৫। গোপীনাথ কাকে খুন করলেন?

৬। ফাঁসির মঞ্চে গোপীনাথ কি বলেছিলেন?

৭। যেটি ঠিক তার পাশে √ এই চিহ্ন দাওঃ

(ক) দেশবন্ধু কংগ্রেস অধিবেশনে গোপীনাথের প্রশংসা করেন নি।

(খ) দেশবন্ধু কংগ্রেস অধিবেশনে গোপীনাথের প্রশংসা করেন।

— —



মহাবিপ্লবী সূর্যসেন

"মাষ্টার দা" এমনই একটা নাম যা বাঙলীর মনে-প্রাণে আজও জেগে আছে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও অন্যান্য গুরু-তর বাঙালী-বিদ্রোহের মহা কুশলী নেতা এই "মাষ্টার দা"।

প্রথম জীবনে শিক্ষকতা করবার সময়েই বিপ্লবী কাজে লিপ্ত হন এবং "মাষ্টার দা" আখ্যায় ভূষিত হন তিনি। অসাধারণ ছিল তাঁর সংগঠন শক্তি ও চরিত্রের দৃঢ়তা। সর্বভারতীয় নেতাদের সাথেও যোগাযোগ রেখে চলতেন তিনি। তাঁর নাম সূর্য সেন।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর চট্টগ্রাম জেলার নোয়াপাড়া গ্রামে সূর্য সেন জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে বি.এ. পাশ করে চট্টগ্রাম হাইস্কুলে তিনি শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। এই সময়ে তিনি স্কুল-কলেজের ছাত্রদের নিয়ে বিপ্লবী দল গঠন করেন।

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে ১০ই এপ্রিল পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালা-বাগে স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বিরাট জনসভা হয়েছিল। ও' ডায়ার নামে এক কুখ্যাত ইংরেজ বিরাট পুলিশবাহিনী নিয়ে নিরস্ত্র জনসাধারণের ওপর অবিরাম গুলি চালায়। ফলে কয়েক হাজার নর-নারীর মৃত্যু হয়এবং অসংখ্য লোক আহত হন। ইহাই "জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড"। এর প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজের দেওয়া 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন। তখন সারা ভারতে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়।

এই সময় সূর্য সেন বিপ্লবীদের বললেন, অস্ত্রের দ্বারা ইংরেজকে শিক্ষা দিতে হবে। বহু তরুণ তাঁর দলে যোগদান করলেন। তাঁর সহকর্মী ছিলেন অম্বিকা চক্রবর্তী, লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, আনন্দ গুপ্ত, টেগরা (টাইগার) বল, অনন্ত সিং, নির্মল সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার এবং কল্পনা দত্ত ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের মত বীরাঙ্গনা মহিলা।

সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য চাই অর্থ। তাই সূর্য সেন সহ-কর্মীদের নির্দেশ দিলেন প্রয়োজনে সরকারী অর্থ লুণ্ঠন করতে হবে।

১৯২৩ খ্রীস্টব্দে ২৩শে ডিসেম্বর রেলকোম্পানীর গাড়ীর টাকা ছিনিয়ে নিয়ে বিপ্লবীরা মাষ্টারদা'র কাছে ছুটে পালালেন। পুলিশ আসছে শুনে তাঁরা পাহাড়ের জঙ্গলে আশ্রয় নেন।

এরপর সূর্য সেন প্রস্তুত হতে লাগলেন ইংরেজদের চরম আঘাত দেবার জন্য। পরিকল্পনা তৈরী হল। গঠিত হল 'ভারতীয় সেনাবাহিনী'। এক ঘোষণাপত্রে সূর্য সেন সমস্ত ভারতীয়কে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার আহ্বান জানালেন। তিনি ঠিক করলেন এক সাথে সরকারী

অস্ত্রাগার, ইউরোপীয়ান ক্লাব ও জেলখানা আক্রমণ করা হবে। সৈন্যের পোষাকে সুসজ্জিত হলেন পঞ্চাশজন যুবক।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল। রেলপথ ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ নষ্ট করে দেওয়া হল। ইংরেজসরকারের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করলেন বিপ্লবীরা। কিন্তু তাড়াতাড়িতে যে রাইফেল ও বন্দুক লুঠ করেছিলেন তার গোলা-বারুদ ততটা আনতে পারেন নি তাঁরা। ফলে পুলিশের সাথে যুদ্ধে তাঁদের পিছু হটতে হল। তাঁরা পার্বত্য জঙ্গলে আশ্রয় নিলেন। এই সময় বিপ্লবীরা দু'দিন চট্টগ্রাম শহরকেইংরেজশাসন-মুক্ত রাখেন।

২২শে মে ইংরেজ রেজিমেণ্ট। বিপ্লবীদের ঘিরে ফেলল। তবুও বিপ্লবীরা যুদ্ধ চালিয়ে যান ইংরেজ সৈন্যের বিরুদ্ধে। ফলে ৬৪ জন ইংরেজ সৈন্য নিহত হল।

এদিকে ইংরেজ সৈন্যের গুলিতে সর্বকনিষ্ঠ বিপ্লবী টেগরাবল ভীষণ আহত হন। লোকনাথ বলের কাছে তাঁর শেষ কথা, "আমি মরছি, কিন্তু তোমরা শেষ অবধি যুদ্ধ চালিয়ে যাও।"

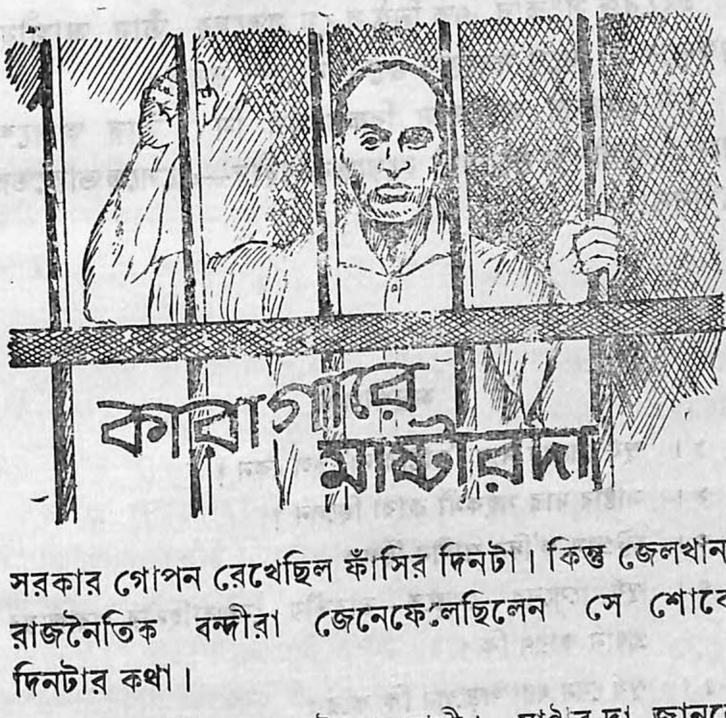
গোলা বারুদ হাতে ছিল খুব কম। তাই বিপ্লবীরা যুদ্ধ করে আর এগোতে পারলেন না। সূর্য সেন ও অনন্ত সিং সঙ্গীদের নিয়ে পালিয়ে যান। কিন্তু পরে লোকনাথ বল ধরা পড়েন চন্দননগরে।

সূর্য সেনকে ধরবার জন্য ইংরেজ পুলিশ ছুটতে লাগল। তখন সূর্য সেন ছিলেন একটা গ্রামে। দশ হাজার টাকার লোভে এক বিশ্বাসঘাতক গ্রামবাসী সূর্য সেনকে পুলিশের হাতে তুলে দিল।

এদিকে ধরা পড়ে বিচারালয়ে সূর্য সেনের সহকর্মী তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসির হুকুম হল এবং কল্পনা দত্তের হল যাবজ্জীবন দীপান্তর।

এবার মাষ্টারদার বিচারের পালা। ইংরেজের বিচার। বিচারের নামে প্রহসন। স্বদেশ-প্রেমিক হয়েও তিনি ইংরেজের কাছে দোষী! প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন সূর্য সেন, আমাদের "মাষ্টার দা"।

ইংরেজের কারাগার। সেখানে শেষ দিনটার জন্য অপেক্ষা করছেন বাঙালী-সিংহ "মাষ্টার দা"। ইংরেজ



সরকার গোপন রেখেছিল ফাঁসির দিনটা। কিন্তু জেলখানার রাজনৈতিক বন্দীরা জেনেফেলেছিলেন সে শোকের দিনটার কথা।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই জানুয়ারী। মাষ্টার দা জানলেন আজই পৃথিবীতে তাঁর শেষ দিন! নিষ্ঠুর ইংরেজ সিপাহীরা তাঁকে মারধর করতে করতে নিয়ে গেল ফাঁসির মঞ্চে। তিনি উঠে দাঁড়ালেন ফাঁসিকাঠে। তখনই গর্জে উঠল জেলের শত শত রাজবন্দী।

মাষ্টার দা আহ্বান জানালেন, "মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে আমি তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। মৃত্যুর জন্য আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই। তোমরা তোমাদের শেষরক্তবিন্দু দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন কর। জীবন মধুর। কিন্তু স্বদেশের জন্য প্রাণ দেওয়া আরও মধুর।"

মুহূর্তমধ্যে সব শেষ! বীর প্রসবিনী বাংলা মায়ের মহাবীর সন্তানের জীবন দীপ নিভে গেল!

ইংরেজ সরকার এত নিষ্ঠুর যে মৃতদেহ তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে না দিয়ে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করল।

সূর্য সেনের আত্মদান বিফল হয় নি। তাঁর আদর্শে অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামী হয়েছেন শহীদ—এসেছে ভারতের স্বাধীনতা।

অনুশীলনী

১। সূর্য সেনের নাম "মাষ্টার দা" হল কেন?

২। মাষ্টার দার সহকর্মী কারা ছিলেন?

৩। চট্টগ্রাম ক'দিন স্বাধীন ছিল?

৪। সূর্য সেনের নেতৃত্বে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর পরাজয়ের প্রধান কারণ কি?

৫। সূর্য সেন ধরা পড়লেন কি করে?

৬। তাঁর ফাঁসি হয় কবে?



বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

১৯২৩ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর। সবে রাতের অন্ধকার শুরু হয়েছে। আর জমে উঠেছে চট্টগ্রামের পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাবে ইংরেজ নর-নারীর নাচ-গান ও পানাহারের উৎসব।

হঠাৎ আলো গেল নিভে। আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল গুড়ুম্ গুম্ দুম্-দাম শব্দ। মুহূর্তে ইংরেজদের আনন্দ কোলাহল বন্ধ হল। শোনা গেল শুধু ভয়ার্ত ইংরেজ নরনারীর আর্তনাদ।

সশস্ত্র পাহারাদার যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। অতর্কিতে ভারতীয় বিপ্লবীরা এইভাবে পাঞ্জাবের জালিয়ান-ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিলেন এই ইউরোপীয়ান ক্লাবঘরে। আর যিনি এই সশস্ত্র বিপ্লবী আক্রমণের নেতৃত্ব দিলেন, তিনি হলেন ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রথম নারী শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। তাঁর ডাক নাম রানী।

প্রীতিলতার বাবার নাম জগবন্ধু ওয়াদ্দেদার এবং মা প্রতিভা দেবী। তাঁর জন্মের পর মা বলেছিলেন, 'এই কালো মেয়েই একদিন সবার মুখ আলো করবে।'

ছোট থেকেই অসাধারণ মেধাবী ছিলেন প্রীতিলতা। বরাবরই ক্লাসে তাঁর স্থান ছিল প্রথম তিনজনের মধ্যে।

প্রীতিলতা চট্টগ্রামে প্রবেশিকা পরীক্ষায়পাশ করার পর ঢাকার ইডেন কলেজে এলেন। এখানে তিনি আই. এ. পাশ করেন। এরপর তিনি ঢাকা থেকে এসে কলকাতার বেথুন কলেজে ভর্তি হন। এখানে তিনি বি. এ. পাশ করেন।

এরপর তিনি চট্টগ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার কাজে যোগ দেন। পরে তিনি ঐ বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীও হন। তাঁর ইচ্ছা ছিল মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার বিষয়ে জীবন উৎসর্গ করবেন।

প্রীতিলতা লেখাপড়া করবার সময় থেকেই অস্ত্র চালনা শিক্ষা করতেন। বিপ্লবী সংগঠনের কাজেও তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেন।

সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের আন্দোলনে প্রীতিলতা প্রধান অংশ গ্রহণ করেন।

তাঁর কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে চললেন পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করতে।

তিনি আক্রমণ করেন ইউরোপীয়ান ক্লাব।

কিন্তু পাল্টা আক্রমণ করল গোরা সৈন্যরা।

প্রীতিলতা সঙ্গীদের নির্দেশ দিলেন—তোমরা সবাই চলে যাও। আমার জন্য ভেব না।

তখন পালাতে লাগলেন বিপ্লবী দলের সকলে।

আহত ক্ষত-বিক্ষত প্রীতিলতা।

তবুও মুখে দুর্জয় হাসি। ইংরেজ সৈনিকদের হাতে ধরা দেওয়ার চেয়ে মৃত্যু বরণ করা অনেক ভাল।

তাই করলেন প্রীতিলতা। স্বেচ্ছায় বিষ খেলেন তিনি।

ঢলে পড়লেন মরণের কোলে।

সংগ্রামস্থলেই আত্মহত্যা করেন প্রীতিলতা, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে।

সেই রক্তাক্ত সংগ্রামে নিজেকে উৎসর্গ করলেন প্রীতিলতা। ভারত মাতা হলেন ধন্য।

প্রীতিলতার এই আত্মত্যাগ বিফলে যায় নি। পরবর্তী কালেও মহিয়সী নারীরা তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তাঁরাও নিজেদের উৎসর্গ করেছেন ভারত মাতার শৃঙ্খল মোচনের কাজে। তাঁরাও শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম জানিয়েছেন অগ্নিকন্যা প্রীতিলতাকে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে শহীদ বিপ্লবীদের নামের তালিকায় প্রীতিলতা নামটিও রক্তের অক্ষরে লেখা হয়ে আছে।

অনুশীলনী

১। প্রীতিলতা কে ছিলেন ?

২। তিনি লেখাপড়া শেখেন কোথায় ?

৩। মাষ্টারদার নেতৃত্বে তিনি কি ভাবে বিপ্লবী দলে আসেন ?

৪। তাঁর বিপ্লব কর্মের প্রধান স্থান ছিল কোথায় ?

৫। সূর্য সেনের নির্দেশে তিনি কিভাবে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন ?

৬। তিনি কিভাবে জীবনদান করেন ?

৭। তাঁর আত্মহত্যার কারণ কি ?



বিপ্লবী মানবেন্দ্র নাথ রায়

মানবেন্দ্র নাথ রায়, এঁর আসল নাম নরেন ভট্টাচার্য। তিনি ইংরেজ ও আমেরিকানদের চোখে যাতে ধরা না পড়েন সেইজন্য তিনি এম. এন. রায় নাম নিয়ে বিদেশে যান। সেই অবধি তিনি এম. এন. রায় নামেই পরিচিত।

নরেন্দ্রনাথ ছিলেন একজন গরিব স্কুল মাষ্টারের ছেলে। স্কুলে পড়বার সময় তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক অভ্যর্থনা সভায় যোগ দেন। এই অপরাধে ইংরেজ শাসনের সমর্থক স্কুলের হেড মাষ্টার মশাই তাঁকে স্কুল থেকে বিতাড়িত করেন।

এরপর তিনি বাড়িতে পড়াশুনো করতে থাকেন। পরে তিনি ইন্জিনিয়ারিং স্কুলে ভর্তি হয়ে নতুন করে লেখাপড়া আরম্ভ করেন।

কিন্তু তাঁর লেখাপড়া বেশীদূর এগোয় নি। লেখাপড়া করবার সময়েই তিনি বিপ্লবী দলে যোগ দেন। তখন তিনি

বাঘা যতীনের সহকর্মীরূপে কাজ করতে থাকেন এবং উত্তর ভারতে সমাজতন্ত্রবাদ প্রচার করতে থাকেন।

বিপ্লবী কাজকর্মের সময়ে তিনি 'হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা'য় গ্রেপ্তার বরণ করেন। বিচারে তাঁর দেড় বছরের জেল হয়।

জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর তিনি আবার বিপ্লবী কাজ শুরু করেন। এই সময় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘা-যতীনের) নির্দেশে তিনি বিদেশে পাড়ি জমান। তিনি জাভা, ফিলিপাইন ও জাপান হয়ে চীনে হাজির হন। উদ্দেশ্য ভারতের বিপ্লবীদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করা।

এই সময় চীনে বিশেষ সুবিধে করতে না পেরে তিনি এম. এন. রায় ছদ্মনামে অস্ত্রশস্ত্র আমদানির জন্য আমেরিকায় যান।

তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যুগ। ১৯১৪ সালে তখন আমেরিকার পুলিশ ভারতীয়দের ওপর কড়া নজর রাখছে। তাই তিনি গোপন পথে আমেরিকা থেকে পালিয়ে যান মেক্সিকোতে। ওখানকার যুবকরা তখন স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি চালাচ্ছিল। এম. এন. রায় তাঁদের সঙ্ঘবদ্ধ করেন এবং ওখানে একটা কমিউনিষ্ট পার্টি গঠন করেন।

রাশিয়ায় তখন লেনিনের নেতৃত্বে 'বলশেভিক পার্টি' গঠিত হয়েছে। লেনিন খবর পান যে রাশিয়ার সহায়তা ছাড়াই এম. এন. রায় মেক্সিকোতে একটা কমিউনিষ্ট পার্টি গঠন করেছেন। তখন তিনি খুব বিস্ময় বোধ করলেন এবং এম. এন. রায়কে রাশিয়ায় আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

লেনিনের আমন্ত্রণে এম. এন. রায়ই একমাত্র ভারতীয় যিনি রাশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির পলিট বুরোর সদস্য হন।

পলিট বুরোর সদস্য হবার পর এম. এন, রায়কে চীন ও

এশিয়ার অন্যান্য দেশে কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনের ভার দেওয়া হয়। তিনিও কৃতিত্বের সাথে এই কাজ করতে থাকেন।

এরপর মানবেন্দ্রনাথ ভারতে আসেন। কিন্তু ভারতে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং তাঁর বিরুদ্ধে মামলা খাড়া করে। ইংরেজ সরকারের বিচারে তাঁর ছয় বছর জেল হয়।

কারাগার থেকে মুক্তি পাবার পর এম. এন. রায় 'র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি নামে একটা রাজনৈতিক দল গঠন করেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি ঐ পার্টির নেতৃত্ব করেন।

মানবেন্দ্র নাথ রায়ের নাম স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নামের তালিকায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়েছে। ১৯৮৬ সালের ১১ই আগস্ট তাঁর জন্ম শতবার্ষিকী কলকাতায় ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে তাঁর অনেক লেখাও স্থান পেয়েছে।

অনুশীলনী

১। মানবেন্দ্র নাথ রায়ের প্রকৃত নাম কি ছিল ?
২। তিনি ছোটবেলায় কার সংস্পর্শে আসেন ?
৩। তিনি কোথায় লেখাপড়া করেন ?
৪। তিনি কোন বিপ্লবীর সহকর্মীরূপে কাজ করেন ?
৫। কোন মামলায় তাঁর জেল হয় ?
৬। কার নির্দেশে তিনি বিদেশে যান ?
৭। কি কারণে তিনি বিদেশে যান ?
৮। তিনি রাশিয়ায় গিয়ে কি করেন ?
৯। ভারতে এসে তাঁর কয় বছর জেল হয় ?
১০। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর তিনি কোন পার্টি গঠন করেন।

———



শহীদ যতীন্দ্রনাথ

১৯২৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। লাহোরের সেণ্ট্রাল জেলের আকাশ বাতাস সেদিন বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে। দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কঠিন-হৃদয় মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত সৈনিকদের চোখেও জল! মৃত্যুঞ্জয়া যতীন্দ্রনাথ ধরাধাম থেকে বিদায় নিয়েছেন! যতীন্দ্রনাথ অনশনে আত্মদান করেছেন।

শহীদ যতীন্দ্রনাথ দাস বিপ্লবী আন্দোলনে আত্মদানকারী মহাপ্রাণ বাঙালী যুবকদের অন্যতম।

১৯০৪ সালের ২৭শে অক্টোবর কলকাতার শ্যামবাজারের ১বি গণেশ মিত্র লেনে মামার বাড়িতে তাঁর জন্ম হয়।

তাঁর বাবার নাম ছিল বঙ্কিম বিহারী দাস এবং মায়ের নাম সুহাসিনী দেবী।

যতীন্দ্রনাথ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর বঙ্গবাসী

কলেজে পড়াশোনা করেন। বি.এ. পড়বার সময় তিনি বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। দক্ষিণ কলকাতার স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনীর নায়ক মেজর সত্যগুপ্তের প্রধান সহায় ছিলেন যতীন্দ্রনাথ। কিন্তু বাংলার বাইরের আহ্বানেও তাঁকে সাড়া দিতে হত। পাঞ্জাবের ভগৎ সিং-এর সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

১৯২৯ সালের ১৪ই জুন লাহোর পুলিশের নির্দেশে কলকাতায় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার করা হ'ল যতীন্দ্রনাথকে। তাঁকে আনা হ'ল লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে। সেখানে জেল-বন্দীদের প্রতি ভাল ব্যবহার করা হত না। তাঁরা যে ইংরেজ সরকারের উচ্ছেদ চেয়েছিলেন! রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা যে তাঁদের প্রাপ্য তা ধর্তব্যের মধ্যেই আনা হ'ল না। বন্দীরা শুরু করলেন অনশন।

বন্দীরা না খেয়ে শহীদের মৃত্যুবরণ করবেন—তা সহ্য করতে পারল না অত্যাচারী ইংরেজ সরকার। তাঁদের জোর করে খাওয়ান শুরু করা হল। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ কিছুতেই খাবার বা ওষুধ মুখে নিলেন না। দীর্ঘ তেষট্টি দিন নির্জলা উপবাস করেন। মৃত্যুবরণ করে চিরঞ্জীবী হলেন যতীন্দ্রনাথ। তিনি দাবী করেছিলেন জেলবন্দীদের প্রতি মানুষের অধিকার।

আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, আত্মবিশ্বাস, দেশাত্মবোধ এবং প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা যতীন্দ্রনাথকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক মর্যাদার আসন দান করেছে। আমরা কোন দিন তাঁকে ভুলব না।

যতীন্দ্রনাথের মৃতদেহ কলকাতায় আনা হল। হাওড়া থেকে কেওড়াতলা শ্মশানঘাট পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মানুষ সজল

চোখে এই মহান দেশপ্রেমিকের প্রতি তাঁদের হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। লক্ষাধিক লোকের মৌন শোকমিছিল অপূর্ব নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে শ্মশানে বহন করে নিয়ে গেছে তাঁর শবাধার। মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছেন সুভাষ চন্দ্র বসু এবং যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

পিতা বঙ্কিমচন্দ্রের আদরের সন্তান খেঁদুর (যতীন্দ্রনাথের ডাক নাম) এই আত্মবলিদান ব্যর্থ হয় নি। স্বাধীনতার সংগ্রাম ছড়িয়ে গেছে শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গ্রামান্তরে।

অনুশীলনী

১। ১৯২৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর গুরুত্বপূর্ণ দিন কেন ?

২। যতীন্দ্রনাথকে কোন মামলায় গ্রেপ্তার করা হয় ?

৩। বন্দীরা অনশন করলেন কেন ?

৪। যতীন্দ্রনাথের শোকমিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কে কে ?

৫। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) যতীন্দ্রনাথ —— কলেজে পড়শোনা করেন।

(খ) পাঞ্জাবের —— সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল।

———

বীর বিপ্লবী
বিনয়-বাদল-দীনেশ

পশ্চিমবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র মহাকরণের সামনে ডালহৌসি স্কয়ার আজ 'বিনয়-বাদশ-দীনেশ বাগ' নামে পরিচিত। তিনজন শহীদের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে বাঙালীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবের এক নবজাগরণের যুগ। বিনয় বোস গুলি করে হত্যা করলেন লোম্যানকে। তিনি হাডসন সাহেবকেও গুলি করলেন। আহত হলেন সাহেব। সেইদিন রাত্রেই বিনয় বোস পালিয়ে আসেন কলকাতায়। তিনি মেটিয়াব্রুজে রাজেন গুহর বাড়িতে আত্মগোপন করে থাকলেন।

এদিকে পরিকল্পনা চলতে থাকে মহাকরণে সিমসন সাহেবকে হত্যা করতে হবে। এই পরিকল্পনা তৈরী করেন হরিদাস দত্ত, প্রফুল্ল দত্ত, রসময় সুর, সুপতি রায় এবং নিকুঞ্জ সেন।

তখন বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত কলকাতায় এক গোপন আস্তানায় ছিলেন! বাদলের বয়স তখন মাত্র আঠার বছর। তিনি ছিলেন ঢাকা বিক্রমপুরের একটা স্কুলের ছাত্র। এই স্কুলের শিক্ষক নিকুঞ্জ সেন ছিলেন বিপ্লবীদের অন্যতম নেতা। তিনি বাদলকে বিপ্লবী আদর্শে অনুপ্রাণিত করেন। দীনেশও

ছিলেন ঢাকার ছেলে। বিপ্লবী কাজকর্মের জন্য তিনি ছিলেন মেদিনীপুরে।

১৯৩০এর ৮ই ডিসেম্বর মহাকরণ অভিযান করতে হবে। আর মাত্র ২১ দিন বাকী। তখন দীনেশ গুপ্তকে নিয়ে আসা হল কলকাতায়।

বিপ্লবী প্রফুল্ল দত্ত ছিলেন একজন ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর পক্ষে মহাকরণে প্রবেশ করা এবং সবকিছুর খোঁজ-খবর নেবার সুবিধে ছিল।

প্রফুল্ল দত্ত খবর আনলেন সিমসন কোন ঘরে বসেন ও কখন আসেন, তাঁর দেহরক্ষী কোথায় থাকে এবং মহা-করণের কোন গেট দিয়ে ঢুকলে বিপ্লবীদের সুবিধে হবে।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর। পরিকল্পনা সব তৈরী। বিপ্লবী নিকুঞ্জ সেন পার্কসার্কাসের গোপন আস্তানা থেকে বাদল ও দীনেশকে নিয়ে এসে পৌঁছে দিলেন রসময় সুরের কাছে।

বেলা তখন ১১টা বেজে ১৫ মিনিট। এর একটু পরই রসময় সুর মেটিয়াব্রুজের বাড়ি থেকে বিনয় বোসকে নিয়ে এলেন।

তিন বিপ্লবী বিনয়-বাদল-দীনেশ মিলিত হলেন। সাথে রইল তিনটে গুলি ভর্তি পাঁচঘরা রিভলবার, পটাসিয়াম সাইনাইড এবং হাতে কিছু ফাইলপত্র। পরণে খাঁটি সাহেবী পোষাক। মাথায় শোলার হ্যাট্।

বিনয়, বাদল ও দীনেশ রওনা হলেন ট্যাক্সি করে মহা-করণের (রাইটার্স বিল্ডিং) দিকে।

যাবার আগে ওঁরা নেতাদের স্যালুট জানিয়ে বলে গেলেন, "শত্রুকে খতম করবই। মৃত্যুকে ভয় করি না।"

বিনয়, বাদল ও দীনেশ ঢুকে পড়লেন মহাকরণে।



বিনয় বাদল দীনেশ

ব্যস, তারপরই তিন বিপ্লবী ঢুকলেন কারা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল সিম্পসন সাহেবের ঘরে। রিভলবার গর্জে উঠল। লুটিয়ে পড়লেন অত্যাচারী ইংরেজ অফিসার।

তাঁরা ছুটলেন পূবের দিকে। নেলসন সাহেবকে গুলি করলেন তাঁরা, কিন্তু লক্ষভ্রষ্ট হলেন। তারপর স্বরাষ্ট্র সচিব প্রেণ্টিস সাহেবের ঘরে গিয়ে দেখলেন সাহেব ঘরে নেই।

ইতিমধ্যে কুখ্যাত টেগার্ড সাহেব এক বিরাট পুলিশ বাহিনী নিয়ে মহাকরণ ঘিরে ফেলেছে।

বিনয়-বাদল-দীনেশ পালাতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের শেষ গুলিটা দিয়ে পুলিশের সাথে মহাকরণের বারান্দায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যান।

বিপ্লবীদের দেহ পুলিশের গুলিতে ক্ষতবিক্ষত হল। তাঁদের গুলি ফুরিয়ে গেল।

বাদল তখন পটাসিয়াম সাইনাইড খেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

বিনয় এবং দীনেশ আত্মহত্যার জন্য রিভলবার থেকে নিজেদের দেহের ওপর শেষ গুলি ছুড়লেন। কিন্তু গুলিতে আহত হলেও তাঁরা তখনো মারা যান নি।

এরপর পুলিশ কমিশনার তাঁদের গ্রেপ্তার করে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে বিনয় নিজ হাতে নিজের ক্ষতস্থান বিষাক্ত করে প্রাণ বিসর্জন দিলেন ১৯৩০-এর ৩০শে ডিসেম্বর।

দীনেশ গুপ্ত কিছুদিন পর সুস্থ হন।

শুরু হল তাঁর বিচার।

ইংরেজ সরকারের আদালতে তাঁর ফাঁসির হুকুম হলো। হাসিমুখে ফাঁসির দড়ি গলায় পরলেন তিনি। তাঁর জীবনাবসান হল ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের ৭ই জুলাই।

ওঁরা আর জনারণ্যে নেই। কিন্তু দেশের কোটি কোটি মানুষ শ্রদ্ধাবনত চিত্তে আজও ঐ তিন বিপ্লবীকে স্মরণ করেন।

অনুশীলনী

১। বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ কোথায় ?

২। এই জায়গাটাকে পশ্চিবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র বলা হয় কেন ?

৩। বিনয় বোস ঢাকায় কি করেছিলেন ?

৪। বিনয়-বাদল-দীনেশ মহাকরণে কাকে হত্যা করেন ?

৫। তাঁরা কোথায় দাঁড়িয়ে পুলিশের সাথে যুদ্ধ করেন ?

ভবানী-ভবন

ভবানী ভবন!

এ নাম যাঁর নামে, তিনি অমর।

বাঙলার বিপ্লবীদের শায়েস্তা করতে বিলেত থেকে আনা হয়েছিল এক সাহেবকে। তার নাম অ্যাণ্ডারসন। তাকে দেওয়া হল গভর্ণর অর্থাৎ ছোট লাট সাহেবের পদ। বিপ্লবীদের শায়েস্তা করবার জন্য তার নির্মম, ব্যবহার ছিল সভ্য সমাজের রীতি-নীতি বিরুদ্ধ।

এই কুখ্যাত অ্যাণ্ডারসনকে খতম করবার জন্য দুই বাঙালী বিপ্লবী গুলির আঘাতে আহত করলেন। ইংরেজ সরকার ঐ কুখ্যাত লাট সাহেবের স্মৃতি রক্ষার জন্য কলকাতায় একটা সরকারী প্রাসাদ গড়ল 'অ্যাণ্ডারসনহাউস' নামে।

কিন্তু বিপ্লবী বাঙালী এটা সহ্য করতে পারে নি। দেশ স্বাধীন হবার পর যুক্তফ্রণ্ট সরকার ১৯৬৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর ঐ প্রাসাদের নাম বদলে নতুন নামকরণ করলেন 'ভবনী-ভবন'।

ভবানী হলেন ভবানী ভট্টাচার্য। যাঁর গুলির আঘাতে আহত হয়েছিল ঐ অ্যাণ্ডারসন লাট সাহেব।

ভবানী ভট্টাচার্যের বাড়ি ঢাকা জেলার জয়দেবপুর গ্রামে। তাঁর জন্ম ১৯৩৪ সাল। বাবার নাম বসন্তকুমার ভট্টাচার্য ও মাতার নাম দময়ন্তী দেবী। স্কুলে পড়বার সময়ই ভবানী বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। এই সময় তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করেন।

কুখ্যাত অ্যাণ্ডারসন সাহেবের প্রাণনাশ করার দায়িত্ব পড়ে এই অকুতোভয় ভবানী প্রসাদের ওপর। একাজে তিনি তাঁর সহকর্মী রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে হাজির হন দার্জিলিংয়ে। এদিকে দুই বিপ্লবী উজ্জ্বলা মজুমদার ও মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় হারমোনিয়ামে লুকিয়ে রিভলবার নিয়ে সেখানে হাজির হন।

১৯৩৪ সালের ৮ই মে।

বাঙলার গভর্ণর স্যার জন অ্যাণ্ডারসন দার্জিলিংয়ে ঘোড়-দৌড় মাঠে পুরস্কার বিতরণ করবার জন্য এসে দাঁড়িয়েছেন।

ভবানী ও রবীন্দ্রনাথ লাটসাহেবের কাছাকাছি এসে দাঁড়ালেন—একেবারে রিভলবারের রেঞ্জ-এর মধ্যে। ভবানীর হাতের অস্ত্র গর্জে উঠল। লাটসাহেবের দেহরক্ষীও গুলি ছুড়ল ভবানীর দিকে। আর একজন ঝাঁপিয়ে পড়ল ভবানীর ওপর। গুলিবিদ্ধ ভবানী হলেন বন্দী। রবীন্দ্রনাথ আহত হয়ে ধরা পড়লেন। ধরা পড়লেন তাঁদের দলের আরও কয়েকজন।

ভবানীর বিচার শুরু হল আদালতে। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, "আমি লাটকে হত্যা করার জন্য এসেছিলাম। খুশী হতাম যদি তাকে একেবারে শেষ করে দিতে পারতাম।"

১৯৩৪ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর আদালতে ভবানী, আর মনোরঞ্জনের ফাঁসির হুকুম হল।

১৯৩৫ সাল। ৩রা ফেব্রুয়ারী।

এই দিনই ভবানী প্রসাদের ফাঁসির দিন। এর দু'দিন আগে তিনি মা-বাবার উদ্দেশ্যে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন, "অমাবস্যার শ্মশানে ভীরু ভয় পায়, কিন্তু সাধক সিদ্ধিলাভ করে।"

ফাঁসির দড়ি গলায় পরে ভবানী সেই সিদ্ধিই লাভ করলেন। মরেও তিনি হয়ে রইলেন অমর!

অনুশীলনী

১। ভবানী ভট্টাচার্য কোন জায়গার লোক ছিলেন ?

২। তিনি কাকে গুলি করেছিলেন ?

৩। তিনি কেন গুলি করেছিলেন ?

৪। ভবানীর সাথে ছিলেন কে ?

৫। ভবানী-ভবন নামকরণ হল কেন ?



রণাঙ্গনে নেতাজী

"তোমরা রক্ত দাও
আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব"—নেতাজী।

এই বজ্রবাণী উত্থিত হয়েছিল স্বাধীনতা-পাগল বীরের আহ্বানে। কে সেই বীর পুরুষ? তিনিই আমাদের প্রিয় নেতা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

ইংরেজী ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর বাবার কর্মস্থল ছিল কটক শহরে। বাবার নাম জানকীনাথ বসু এবং মায়ের নাম প্রভাবতী দেবী। তাঁদের আদি বাসস্থান ২৪ পরগণা জেলার কোদালিয়া গ্রামে। এখন এ জায়গার নাম সুভাষগ্রাম। তিনি ছেলেবেলা থেকেই ধুতি ও জামা পরতেন। তিনি তাঁর বাবাকে বলেছিলেন, "আমি জাতীয় পোষাক পরতে ভালবাসি"। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন স্বদেশ প্রেমিক।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাট্রিক পাশ করবার পর সুভাষচন্দ্র

প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু কলেজের অধ্যাপক ওটেন সাহেবকে নিয়ে একটা ঘটনার ফলে তিনি কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হন। পরে বাংলার 'বাঘ' আশুতোষের চেষ্টায় সুভাষচন্দ্র স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দর্শন শাস্ত্রে অনার্স বি. এ. পাশ করেন।

এরপর সুভাষচন্দ্র বিলেতে আই. সি. এস. পাস করেন ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু তিনি ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরি করলেন না। তাঁর ইচ্ছে তিনি দেশের সেবা করবেন।

সুভাষচন্দ্র দেশে ফিরে এসে দেশবন্ধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত হন।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে রাজদ্রোহের অপরাধে তিনি কারারুদ্ধ হন। জেলে থাকা কালেই তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন।

জেল থেকে ছাড়া পাবার পরেও সুভাষচন্দ্র বার বার কারাগারে আবদ্ধ হন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্রের প্ররোচনায় কলকাতায় কুখ্যাত 'হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভ' বিধ্বস্ত হয় এবং সুভাষচন্দ্র আবার কারারুদ্ধ হন।

তিনি দু'বার কংগ্রেসের সভাপতি হন। কিন্তু কংগ্রেসের সাথে তাঁর মতপার্থক্য হওয়ায় তিনি আলাদা দল গঠন করেন - 'ফরওয়ার্ড ব্লক'।

এরপর ইংরেজ সরকার সুভাষচন্দ্রকে তাঁর নিজের বাড়িতেই অন্তরীণ করে রাখে। তিনি তখন ভাবলেন বিদেশী শক্তির সাহায্য নিয়ে ভারতকে স্বাধীন করতে হবে।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস। মহাবীর শিবাজীর অনুকরণে কাবুলিওয়ালা বেশে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি

চলে যান কাবুলে। সেখান থেকে রাশিয়ায় এবং রাশিয়া থেকে জার্মান দেশে চলে যান তিনি।

এ সময় চলছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ইংরেজরা যুদ্ধে না পেরে মালয় ও বর্মা থেকে পালিয়ে যায়। তখন তারা ভারতীয় সৈন্যদের ওখানে ফেলে চলে যায়। এঁদের সংখ্যা ছিল অনেক। এই সময় জাপানে এই সব ভারতীয়-দের নিয়ে গঠিত হয়েছিল সেনাবাহিনী। সভাপতি ছিলেন মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র



আই. এন. এ-র নারীবাহিনী

সাবমেরিণে করে জার্মানি থেকে জাপানে এলেন এবং এই আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হলেন। এই সময় তিনি 'নেতাজী' আখ্যায় ভূষিত হন। তখন এই বিদেশে বসে সুভাষচন্দ্র এক ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং

জাপান ও জার্মানী এই সরকারকে মেনে নেয়। তাঁর গঠিত ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্মিতে নারী বাহিনীও ছিল। এই বাহিনীর নাম ছিল ঝান্সি র। রাণী বাহিনী। তাঁর সৈন্যদলে শিশু বাহিনীও ছিল। এদের বয়স এক থেকে দেড় বছর। যখন আজাদ হিন্দ বাহিনী ইংরেজ সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করে না পেরে পিছিয়ে যেত তখন এই সব বাচ্চাদের রাস্তার ওপর ছড়িয়ে রেখে যেত। এদের হাতে থাকত রঙীন সব খেলনা। এই খেলনাগুলো সবই সাংঘাতিক বোমা। ইংরেজ সৈন্য যখন এদের মাড়িয়ে যেত তখন এগুলো ফেটে ইংরেজ সৈন্য ধ্বংস হয়ে যেত। নেতাজী এমনই এক নায়ক যাঁর জন্য মায়েরা এই শিশুদের দিয়ে দিতেন। এই দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। তাঁর গলার মালা বিক্রি হত কয়েক লাখ টাকায়।

এক রাতের বেলায় নেতাজী তাঁর সহকর্মীকে বললেন জীপ গাড়ি নিয়ে এস। আমি ওখানে যাব। সহকর্মী বললেন ওখানে তো বোমা পড়ছে। নেতাজী বললেন, আমার লোকের ওপর বোমা পড়বে আর আমি ঘরে বসে থাকবো? চালাও গাড়ি।

একজন আজাদ হিন্দ সৈনিক বলেছেন, নেতাজীর অদূরে একটা বোমা পড়ে ছিটকে এসে নেতাজীর পায়ের কাছে থেমে গেল। অর্থাৎ এরা বলতে চান নেতাজী ভগবান।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস। শুরু হলো দিল্লী অভিযান। যুদ্ধ জয় করে যেতে হবে দিল্লী। দিল্লী চলো। জয় হিন্দ! হাজার হাজার স্বদেশপ্রেমী আজাদ হিন্দ সৈন্য এগিয়ে চললেন দিল্লীর দিকে। এগিয়ে এসে দখল করলেন ভারতের পূর্ব সীমান্তের মোওডক ইংরেজ ঘাটি। ভারতের মাটিতে উড়ল জাতীয় পতাকা।

আর এক অংশে চলছে যুদ্ধ। আজাদ হিন্দ বাহিনী দখল করলেন মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল। সেখানেও উড়ল জাতীয় পতাকা।

অন্যদিকে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জও আজাদ হিন্দ বাহিনী দখল করলেন। নেতাজী এলেন আন্দামানে। সেখানেও উড়ল জাতীয় পতাকা। এ দ্বীপের নাম হল 'শহীদ দ্বীপ'।

কিন্তু ভারত-ভাগ্য-বিধাতা বিরূপ। যুদ্ধের মোড় গেল ঘুরে। জাপানীরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। তখন-খাদ্য ও রসদের অভাব এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য আজাদ হিন্দ বাহিনীও আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। নেতাজী বিমানে করে হলেন অন্তর্ধান।

নেতাজীর দিল্লী অভিযান সফল হল না বটে, কিন্তু ইংরেজ ভারতবর্ষ ছাড়তে বাধ্য হল। স্বাধীন হল ভারত। উড়ল জাতীয় পতাকা। তাই তিনি হিন্দু-মুসলমান খ্রীষ্টানের মিলিত বীর-বাহিনীর রণাঙ্গণে পরম প্রিয় মহাবীর ও মহাবিপ্লবী নেতাজী।

অনুশীলনী

১। সুভাষচন্দ্রের জন্মস্থান কোথায়?

২। তিনি ছোটবেলায় বাবাকে কি বলেছিলেন?

৩। তিনি আই. সি. এস. পরীক্ষায় পাস করেও চাকুরি করলেন না কেন?

৪। আজাদ হিন্দ বাহিনী কেমন ছিল?

৫। আজাদ হিন্দ বাহিনী ভারতের মধ্যে কতদূর এসেছিল?

৬। তাঁর দিল্লী অভিযান সফল হল না কেন?

সমাপ্ত